ভে ত রে

মোদী প্রশাসনের মডেল ২
কৃষক স্বার্থ বিরোধী কৃষি বিপণন বিলের বিরুদ্ধে ... ৩
মোদীর ... গ্যাট চুক্তির পিতৃসত্য ... ৪
প্যারিস হামলাকে ধিক্কার ৫
সময়টা কি 'দুর্বোধ্য'! ... ৬
হর্স ট্রেডিং-এর কারবার ৭

আজকের দেশব্রতী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২২ সংখ্যা ৪ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২২ জানুয়ারী ২০১৫

মোদী সরকারের কৃষি জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ

(গত ৮ জানুয়ারি ''আজকের দেশব্রতী'' সংখ্যায় জমি অধিগ্রহণের পূর্বে কৃষকদের সম্মতি গ্রহণের ধারাকে বাতিল করে জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স জারির বিরুদ্ধে সারা ভারত কিষাণ মহাসভা ২ জানুয়ারি সারা দেশে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে উল্লেখিত হয়েছিল। নিচে পড়ুন তার কিছু রাজ্যওয়াড়ি রিপোর্ট।)

উত্তরপ্রদেশে প্রতিবাদ সংগঠিত হয় রাজধানী লক্ষ্ণৌ, গাজিয়াপুর জেলার সদর শহরে, জামানিয়া, ভাদোরা, বেরিলি, পিলভিট, কানপুর এবং অন্যান্য স্থানে। ঝাড়খণ্ডে অর্ডিন্যান্স-বিরোধী জনসভা ও প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় গিরিডি, বগোদর, দেওরি ও রামগড়ে। রাজস্থানের ঝুনঝুনু, মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ, ছত্তিশগড়ের দুর্গ প্রভৃতি স্থানে সি পি আই (এম এল) অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়।

অন্ধ্রপ্রদেশে পূর্ব গোদাবরির সদর কাঁকিনাড়া, কুরনুল, শ্রীকাকুলাম ও পালাসা জেলায় অর্ডিন্যান্স-বিরোধী মিছিল, প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়, মোদীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। এই সমস্ত কর্মসূচীতে ব্যাপক সংখ্যক কৃষক অংশগ্রহণ করেন। উত্তরখণ্ডের বিন্দুখাট্টায় কৃষকরা প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। পশ্চিমবাংলায় দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলি, নদীয়া ও বর্ধমানে জনসভা, প্রতিবাদ মিছিল ও কুশপুতুল পোড়ানোর কর্মসূচী সংগঠিত হয়।

পাঞ্জাবে ২ থেকে ৭ জানুয়ারি অর্ডিন্যান্স-বিরোধী প্রতিবাদ সপ্তাহ রূপে সংগঠিত হয়। এরই সাথে পাঞ্জাব সরকারের ''সরকারি, গইর সরকারি, নিজি সম্পত্তি নুকসান রোক'' বিল-এর বিরুদ্ধেও ঐ সপ্তাহে বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভা সংগঠিত হয় মানসা, ভিকি বাজার, গুরুদাসপুর, পাতিয়ালা, ভাতিণ্ডা, ফিরোজপুর ও কার্ণালে।

বিহারে পাটনা জেলার ৯টি ব্লকের সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুতুল পোড়ানো কর্মসূচী সংগঠিত হয়। পাটনা শহরের সভায় ঘোষণা করা হয় যে, ২০১৫-এর ২৭ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ''রাজ্যব্যাপী কিষাণ পক্ষ'' রূপে সংগঠিত হবে এবং তার সাথে সারা রাজ্যে শস্য ক্রয় কেন্দ্রগুলো থেকে ভাগচাষীদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য দাবি জানানো হবে। ভোজপুর, আরোয়াল, ঔরঙ্গাবাদ, ভাগলপুর, জাহানাবাদ, সিওয়ান এবং অন্যান্য জেলার নানা স্থানেও অর্ডিন্যান্স-বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের সফল অষ্টম রাজ্য সম্মেলন

বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের বিদায়ী যুগ্ম-রাজ্য সম্পাদকের অন্যতম অমিত দাশগুপ্ত। শ্রোতার আসনে সবার সামনে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

- কেন্দ্রের জমিগ্রাসের অর্ডিন্যান্স বাতিল কর
- পুঁজিপতিদের স্বার্থে গৃহীত রাজ্যের কৃষি বিপণন আইন বাতিল কর
- সারা বছর কাজ, ন্যায্য মজুরি ও ১০০ দিনের বকেয়া মজুরি দাও

৪ ফেব্রুয়ারি
ধর্মতলা চলো
বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বক্তা ঃ কার্তিক পাল,
সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

জমায়েত—দুপুর ১টা
কলেজ স্কোয়ার

পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতি ও
সারা ভারত
কৃষিমজুর সমিতির আহ্বানে

মোদী প্রশাসনের মডেল
ভারতীয় কৃষক এবং আন্দোলনের কর্মীদের নিপীড়ন আর বিদেশী কর্পোরেশনগুলোকে তোষণ

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস যখন এগিয়ে আসছে, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের উপর কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক ছায়া ক্রমশই তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। মোদী সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেশন এবং অন্যান্য বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে ভারতে আমন্ত্রণের জন্য যেমন শ্রমিক, কৃষক ও নাগরিকদের সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে ছেঁটে ফেলছে, তেমনি প্রতিবাদী কৃষক ও আন্দোলনের কর্মীদের 'বিদেশী দালাল' রূপে অভিহিত করে তাদের জেলে পুরছে এবং তাদের ভ্রমণকে আটকাচ্ছে।

সম্প্রতি যে ভাইব্র্যান্ট গুজরাট সম্মেলন হয়ে গেল তাতে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরি এবং একগুচ্ছ মার্কিন কর্পোরেশন ও অন্যান্য বহুজাতিক সংস্থা, আর যোগদান করেছিলেন মুকেশ আম্বানি এবং কুমার মঙ্গলম বিরলার মত ভারতীয় কর্পোরেট প্রধানরা। ঐ সম্মেলনে তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁদের ''ভারতে নির্মাণ করুন''-এর আহ্বান জানালেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন ''ভারতে কম মজুরিতে উচ্চ মানের শ্রম শক্তি''র লভ্যতার জন্য ''উৎপাদন ব্যয় অনেক কম হবে'' এবং তাঁর সরকার নির্মাণ, রেল, প্রতিরক্ষা ও বীমা ও ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে সুনিশ্চিত করতে এবং তার সাথে শ্রম আইন সংস্কারে যে উদ্যোগগুলো নিয়েছে সেগুলোকে তুলে ধরলেন।

''কম মজুরির শ্রমশক্তি'' বলতে প্রাপ্যর চেয়ে কম মজুরি পাওয়া ও বেশি সময় ধরে কাজ করা শ্রমশক্তি এবং কর্মস্থানে শিথিল নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই বোঝায়। ভারতের কারখানাগুলোতে শ্রম আইন ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে এবং তা বিশেষভাবে ঘটছে ন্যূনতম মজুরি প্রদান সুনিশ্চিত করা, সম কাজে সম বেতন এবং ইউনিয়ন গঠনের অধিকার সম্পর্কিত আইনগুলোর ক্ষেত্রে। এই ব্যাপারে মোদী যে অবদান রেখেছেন তা হল, তাঁরা শ্রম আইন মেনেছেন বলে উৎপাদকরা নিজেরাই সার্টিফিকেট দিতে পারবেন বলে তিনি ঘোষণা করেছেন—যার প্রকৃত অর্থ হল, সরকার তাদের বলছে যে শ্রম আইন বলবৎ করার দায় সরকার তার কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলেছে। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে যে, জামা-কাপড় তৈরির কারখানায় জনৈক মহিলা সঙ্গে মোবাইল ফোন রাখায় শাস্তিস্বরূপ তাঁকে থুতু পরিষ্কার করতে হয় এবং একটি সেজের ৪৫ জন মহিলাকে নগ্ন করে তল্লাশি করা হয় যে তারা মাসিকের সময় ব্যবহৃত প্যাড পরে আছে কিনা। কার্যত দাসত্বের পরিস্থিতিতেই যে শ্রমিকদের 'ভারতে নির্মাণ করতে হচ্ছে' এগুলো তার সামান্যই নিদর্শন। শিথিল সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য নির্মাণ স্থলে, কারখানায়, খনিতে ও সাফাই কাজে মৃত্যু অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূপাল বিপর্যয় এবং তার সাথে পুলিশের গুলিতে জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রতিবাদী কৃষক ও আদিবাসীর মৃত্যু শুধু এই কথাটাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে শ্রমের 'মূল্য শুধু কমই' নয়, ভারতীয় এবং বিদেশী কর্পোরেশনগুলোকে আকৃষ্ট ও তুষ্ট করার জন্য ভারতীয়দের জীবনের 'মূল্যকেও নীচু স্তরে' রাখা হয়েছে। কেরি বলেছেন, ওবামা তাঁর প্রজাতন্ত্র দিবস সফরকালে যা অর্জন করতে চাইবেন তা হল, অসামরিক পারমাণবিক দায়বদ্ধতা আইনকে আরও লঘু করে তোলা, যাতে ভারতের মাটিতে মার্কিন পারমাণবিক কর্পোরেশনগুলো দ্বারা সংঘটিত ভূপাল বা ফুকুশিমা ধরণের কোন বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত দায় ভারতকেই বহন করতে হয়।

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল, জমি গ্রাস, পরিবেশকে দূষিত করা, মানুষের শরীরে বিষ ঢুকিয়ে হত্যা করা, শ্রম আইন লঙ্ঘন করা এবং শ্রমিকদের শোষণ করার জন্য বিদেশী কর্পোরেশনগুলোর সামনে যখন লাল গালিচা বিছিয়ে দেওয়া ও তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দেওয়া হচ্ছে, তখন প্রতিবাদী কৃষক ও আন্দোলনের কর্মীদের ভারতের উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রতি বিপদ বলে ছাপ মারা হচ্ছে!

ভাইব্র্যান্ট গুজরাট সম্মেলনের সময় যে কৃষকরা জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিলেন তাদের আটকানো হয়। পরিবেশ আন্দোলনের এক কর্মীকে বিমানে চাপতে দেওয়া হয় না এই অছিলায় যে, তদন্ত ব্যুরো তাঁর ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তদন্ত ব্যুরোর কিছু প্রচ্ছন্ন সুপারিশ ছাড়া সরকার পরিবেশ আন্দোলনের ঐ কর্মীর ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কোন কারণ হাজির করতে পারেনি।

বিজেপি প্রতিনিধিরা ঐ কর্মীর ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞার সমর্থনে এসার নামক কর্পোরেশনের বন অধিকার আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তাঁর ভূমিকার কথা তুলে ধরছেন। এসার গ্রেট-ব্রিটেনে নথিভুক্ত একটি কোম্পানি হওয়ায় ঐ কর্মী ব্রিটেনে গিয়ে ভারতীয় জনজাতিদের অধিকার সুরক্ষার ভারতীয় আইনগুলো লঙ্ঘনে ঐ কোম্পানির ভূমিকা সম্পর্কে সেখানকার আইন প্রণেতাদের অবগত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিবেশ আন্দোলনের ঐ কর্মীর উপর নিষেধাজ্ঞার সূত্র রয়েছে ২০১৪-র জুনে প্রধানমন্ত্রীর কাছ পেশ করা তদন্ত ব্যুরোর রিপোর্টের মধ্যে, যে রিপোর্টে 'বিদেশী অর্থে পুষ্ট এন জি ও-রা' ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলছে বলে দাবি করা হয়।

এর মধ্যে পরিহাসের ব্যাপারটা হল এই যে, সরকার ভারতের অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদেশী বিনিয়োগকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এবং তার জন্য ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও পরিবেশকে যথেষ্ট মূল্য চোকাতে হচ্ছে। এর আগের সরকারে যোজনা কমিশনের প্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর মতই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টারও আই এম এফ-এর সঙ্গে যোগ রয়েছে। বিশেষ মতাদর্শ দ্বারা চালিত এই সমস্ত ব্যক্তির কল্যাণে ভারতের অর্থনীতিকে এমনভাবে রূপায়িত করা হচ্ছে যাতে তা ভারতীয় জনগণের অগ্রাধিকারের চেয়ে বিশ্ব পুঁজির স্বার্থের সঙ্গেই খাপ খায়।

সরকারের নির্ভেজাল কপটতা এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, মোদী মন্ত্রীসভার এক পূর্ণমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী সুরেশ ভরদ্বাজ পর্যন্ত বিদেশী অর্থপুষ্ট পরিবেশ সম্পর্কিত এক এন জি ও-র প্রধান। বিশ্বের অনেক কর্পোরেশনই এন জি ও বানায়, উদ্দেশ্য বিশ্ব পরিবেশের উপর তাদের আক্রমণকে ''সবুজের ধাপ্পায় আড়াল করা''। স্পষ্টতই, এই সমস্ত এন জি ও তদন্ত ব্যুরোর নজর এড়িয়ে যায়, কেননা নীতিগত দিক থেকে তারা সরকারি ও কর্পোরেট লাইনকেই অনুসরণ করার দিকে ঝোঁকে! একমাত্র যারা বিরোধিতা করে তাদেরই দেশের প্রতি 'বিপদ' বলে ছাপ মারা হয় এবং তাদের বাক স্বাধীনতা, যাতায়াত ও প্রতিবাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়।

যথাযথভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় মোদী 'ক্লাইমেট গ্রুপ' নামে এক এন জি ও-র সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষর করেন যার সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের যোগ ছিল। আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে মোদী যে বই লিখেছেন তার মুখবন্ধ লিখেছেন ঐ একই বিদেশী-অর্থপুষ্ট এন জি ও-র প্রধান! ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, আমলা, কূটনীতিবিদ এবং কর্পোরেট প্রধানদের এক চক্র যে ভূপাল গ্যাস বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ডাউ কেমিক্যালসকে নির্মলীকরণ এবং ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধতা থেকে কিভাবে বাঁচানো যায় সে ব্যাপারে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ও মার্কিন সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা চালিয়েছিলেন, সেকথা ২০০৯ সালে ফাঁস হয়ে যায়। এটা অতএব প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভারতের সরকারগুলো সেই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থাকে রক্ষার জন্য তাদের নেতৃবৃন্দকে বিদেশী কর্পোরেশন ও বিদেশের সরকারগুলোর সঙ্গে গোপন আলোচনা ও বোঝাপড়া চালাতে দেয় যে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর হাতে ভারতীয় নাগরিকদের রক্ত লেগে আছে! অন্যদিকে পরিবেশ আন্দোলনের এক কর্মীকে ওরা এই অছিলায় বিমান থেকে নামিয়ে দেয় যে, গ্রেট ব্রিটেনে তালিকাভুক্ত এক কর্পোরেশনের অপরাধ সম্পর্কে সেখানকার আইন প্রণেতাদের অবহিত করার কোন অধিকার তাঁর নেই!

প্রজাতন্ত্র দিবস যখন এগিয়ে আসছে, ভারতের নাগরিকদের তখন উঠে দাঁড়াতে হবে এবং মোদী ও ওবামাদের সোজাসুজি বলে দিতে হবে যে, তাঁদের নীতিই ভারত এবং বিশ্বের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলছে!

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১৩ জানুয়ারি ২০১৫)

সম্পাদকীয়

নারীর উপর পুলিশী নারকীয়তা

আবার সংবাদ জগতের শিরোনামে পাড়ুইয়ের নৃশংসতা। এবার দায়ী সরাসরি পুলিশ অফিসার। জনৈকা মুসলিম গৃহবধুকে রাতের অন্ধকারে পিত্রালয় থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে পথের মাঝে গাছে বেঁধে বর্বর অত্যাচার করা হয়। সমস্ত শরীরে লাঠি মারা হয়েছে, দেহের বিভিন্ন জায়গায় এমনকি গোপনাঙ্গে বিষাক্ত বিছুটি পাতা ঘষে দেওয়া হয়েছে, হাতের আঙ্গুল ও তালুর সংযোগস্থল কেটে দিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। অত্যাচারিতা মহিলা যন্ত্রণা সইতে না পেরে বেহুঁশ হয়েছেন, হুঁশ ফিরিয়ে আবার আগাপাশতলা অত্যাচার করা হয়েছে। অতি পরিচিত পুলিশের থার্ড ডিগ্রী অত্যাচার এখন থানার বাইরেও পথপাশে সংঘটিত হচ্ছে। বেহুঁশ গৃহবধুকে অতঃপর নিয়ে যাওয়া হয় থানায়, সেখানে হুঁশ ফিরলেও হেফাজতে অত্যাচারের তথ্য আড়াল করার উদ্দেশ্যেই তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত না করে গোপনে তাঁর স্বামীকে ডেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যে পৈশাচিক অত্যাচার চালানো হয় তার ফলে জীবন্ত লাশ হয়ে যাওয়ার পরিণাম ঘটতেই পারতো, যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট অত্যাচারি পুলিশের কোন দ্বিধা ছিল না, মহিলাকে উপর্যুপরি ক্ষতবিক্ষত করা হয় শারীরিক মানসিকভাবে। পারিবারিক উদ্যোগে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি না হলে মৃত্যু হতে পারতো। অভিযোগ উঠেছে পুলিশী মর্ষকামীতা নিয়েও। যে পুলিশ অফিসার ঐ অপারেশনের পাণ্ডা তার অনুরূপ নজীরস্থাপনের 'কীর্তি' আছে আরও। হেফাজতে পিটিয়ে মারা থেকে গ্রেপ্তারী অভিযান চালাতে গিয়ে এলোপাথারি গুলিবর্ষণ, হেফাজতে থাকা নিরপরাধী বন্দীকে ফের বাড়ি থেকে ধরে এনে আদালতে চালান দেওয়া—এরকম অনেক কিছুই। তবু পাড়ুইয়ের ঘটনা স্রেফ একজন শয়তান পুলিশ অফিসারের একক বীভৎসতার বিষয় নয়। অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছে আরও তিন ঘাঘু পুলিশ অফিসারের নাম—বোলপুরের এস ডি পি ও, সি আই এবং ইলামবাজার থানার ওসি। লাখ টাকার বিনিময়ে অভিযোগপত্র প্রত্যাহার করানোর টোপ ও হুমকি দেওয়ার আসরে নামেন পার্শ্ববর্তী বুদবুদ থানার 'বড়বাবু'-'ছোটবাবু'রা। কিন্তু নিগৃহীতা ও তাঁর পরিবারকে টলানো যায়নি। বরং তাঁদের ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও ন্যায়বিচারের দাবি রাজ্যজুড়ে প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। তারই বাধ্যতায় উর্দ্ধতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের তরফে একদিকে প্রথমে পয়লা নম্বরের অভিযুক্ত অফিসারটিকে 'ক্লোজ' করা হয়েছে, অপরদিকে একজন এ এস পি-কে দিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কথা হল, যেক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত, আর বিচার বিভাগীয় তদন্তই যখন নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের স্বার্থে আবশ্যিক, তখন পুলিশ দিয়ে পুলিশের অপরাধের তদন্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানমুখী হতে পারে না। অন্যদিকে উচ্চ ন্যায়ালয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে এই মামলাটির বিচারের ভার গ্রহণ করেছে তার ওপর নির্ভর করছে কি ন্যায়বিচার পাওয়া? যদিও মামলা গ্রহণকালীন উচ্চ-ন্যায়ালয়ের উষ্মা বুঝে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের কোনও উচ্চবাচ্যই নেই। থাকবে কি করে? কমিশনের খোদ বর্তমান চেয়ারম্যান তো মুখ্যমন্ত্রীর মনোনীত ও আজ্ঞাবহ একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। 'তোতা' অফিসারের পুরষ্কার হিসেবেই তিনি কমিশনের চেয়ারম্যান পদটি পেয়েছেন। নিশ্চুপ থেকে তিনি তারই প্রতিদান দিচ্ছেন। রাজ্যের নারী কমিশনের সদস্যরা অবশ্য অত্যাচারিতার সাথে সাক্ষাৎ করে নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন, শাস্তির সুপারিশ করবেন বলেছেন। যদিও নারী কমিশনের প্যানেলেও রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের প্রতিনিধিরা। তাই শেষমেশ তারা কি করবেন, তাদের সুপারিশ সরকারের মান্যতা পাবে কী না, তা নিশ্চিত নয়।

সঙ্গত প্রশ্নই উঠেছে, বিশেষত এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন মহিলা, আর তাঁর হাতেই যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও সংখ্যালঘু মন্ত্রক, তখন এহেন ঘটনায় তিনি নীরবতার অবস্থানে কেন? 'সাজানো ঘটনা' দাবি করা সম্ভব নয় বুঝেই! স্বীকার করলে ক্ষোভবিক্ষোভ বর্ষানোর ভয়ে! তিনি উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগ রচনায় অতিব্যস্ততায়। তৃণমূলী সাফাই দেওয়ার ভারপ্রাপ্ত এখন দলের মহাসচিব মায় শিক্ষামন্ত্রী। তিনি দায় সারছেন তদন্ত হচ্ছে বলে! নারীর উপর নারকীয় পুলিশী সন্ত্রাস সংঘটিত হওয়ার পরিমণ্ডলগত মদত মিলছে শাসকদলের ডাকসাইটে মন্ত্রী-নেতাদের কীর্তিকলাপেই। উদাহরণ রয়েছে বহু। বর্ণময় নেতার ইচ্ছাপূরণের পরিণামে মহিলা আইনজীবীকে রহস্যপূর্ণ আত্মহত্যার মাশুল গুণতে হয়েছে। শাসকদলের পরের পর গোষ্ঠী সংঘাতের শিকার বানানো হয় মহিলাদের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোন বিরোধিতাকে সবক শেখাতে তৃণমূলী পরিষদ পাণ্ডারা প্রকাশ্যে নারী নিগ্রহের 'বীরত্ব' ফলায়। আর যে জেলার পাড়ুইয়ে নারীর এতো বীভৎস লাঞ্ছনা সেই বীরভূমকে তৃণমূল পরিণত করেছে কেষ্ট-মণিরুল মাফিয়া সন্ত্রাসের পীঠস্থানে। তৃণমূলের বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের মহিলা সাংসদ বাহানা করছেন! তিনি নাকি দলে 'খোঁজ নিয়ে' যা বলার বলবেন, যা করার করবেন! কিন্তু 'খোঁজ' আর নেওয়া হয় না।

মওকা বুঝ ওত পেতে প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিচ্ছে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের দল বিজেপি। তৃণমূল যতই স্বৈর আধিপত্য-কায়েমী হচ্ছে, বিরোধাভাসকে বিধ্বস্ত করতে জনবিরোধী হচ্ছে, দুর্নীতি-প্রতারণা-তোলাবাজী প্রবণ হচ্ছে, গোষ্ঠীসংঘাত ও খুনোখুনিতে মত্ত হচ্ছে; ততই তার শাখাপ্রশাখায় ভাঙ্গন, সামাজিক ভিত্তিতে ধস ত্বরান্বিত হচ্ছে। এর ফলে এমনকি সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক গিলে নিতে বাজী ধরা তৃণমূলে থেকে অতীষ্ট হয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিরাপত্তার হাতছানিতে বিজেপিমুখী হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূলই জায়গা করে দিচ্ছে বিজেপিকে।

তৃণমূল সরকারের কৃষক স্বার্থ বিরোধী কৃষি বিপণন বিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসেছে প্রায় ৪ বছর হতে চলল। 'পরিবর্তনের সরকার', 'মা-মাটি-মানুষের সরকার', 'কৃষক দরদী সরকার' বলে তারা নিজেদেরকে দাবি করে। তাঁদের ক্ষমতায় আসার পেছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন তথা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের উত্থান। মা-মাটি-মানুষের উন্নয়নে তৃণমূল নেতাদের ঘুম নেই। এখন দেখা যাক গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের জন্য তাঁরা কি কি করছে।

গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমন ধান কাটা প্রায় শেষ হতে চলল, বহু কষকের ধান অনেকটাই খামার বা বাড়ীতে তোলা হয়ে গিয়েছে, গোলায়ও উঠতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত একটি গ্রামের তথ্যচিত্রের কথায় আসা যাক। গ্রামটি বর্ধমান জেলার মূলত ধানচাষের এলাকা নাদনঘাটের অন্তর্গত। কথা প্রসঙ্গে একজন চাষী দুঃখ করে বললেন, খামারে ২০০ মন ধান আছে, কিন্তু ১০০ টাকা নেই ছেলেকে ডাক্তার দেখানোর জন্য। ধান বিক্রি করতে চাইছি, কিন্তু কোন খরিদ্দার নেই। দাম ৬৫০ টাকা বস্তা (মানে ৬০ কেজি) দরে হলেও ক্রেতা নেই। ফড়েরা ধান কেনার ঝুঁকি নিচ্ছে না। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আর একটি গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচীতে গিয়ে দেখা গেল একজন চাষী বলছেন, ৭২০ টাকা করে ধান বিক্রি করলাম প্রায় একমাস হল, এখনও এক মহাজনের থেকে এক টাকাও পেলাম না। তারপরেই আনন্দবাজার পত্রিকা লিখল বর্ধমান জেলায় সরকারের ধান কেনার শিবিরে কৃষকরা ধান বিক্রি করতে যাচ্ছে না, ফলে শিবির গুটিয়ে দিতে হল।

গত ৩০ ডিসেম্বর আউস গ্রাম ২ নং ব্লক অফিসে গেলে কথা প্রসঙ্গে বিডিও সাহেব বললেন, ঐদিনই ব্লকের সমস্ত সমবায়গুলোকে নিয়ে ধান সংগ্রহের ব্যাপারে বিডিও অফিসে মিটিং হয়েছে। তাতে সমবায়গুলো রাজী হয়েছে ৫০ শতাংশ টাকা দিলে সমবায়গুলো ধান সংগ্রহ করতে পারবে। আর বস্তা পিছু চাষীদের ৩ কেজি করে ছাঁট বাদ দিতে হবে। এটা বিডিও-র কাছে সুখবর মনে হল।

এই বছর সরকার ধানের সংগ্রহ মূল্য ঘোষণা করেছে ১৩৬০ টাকা কুইন্টাল। তার উপর যদি আউস গ্রামের বিডিও-র কথা অনুযায়ী ৬০ কেজি বস্তা পিছু ৩ কেজি ছাঁট বাদ দেওয়া হয়, তাছাড়া ধান শিবিরে নিয়ে যাওয়ার যাতায়াত খরচ বস্তা পিছু ২০ টাকা ধরা হয়। তাহলে শিবিরে ধান বিক্রি করে চাষী প্রকৃত দাম পাবে। (১৩৬০ টাকা কুইন্টাল হিসাবে) ৬০ কেজি বস্তায় ৭৫৫.২০ টাকা। বস্তা পিছু আপাত মূল্য দাঁড়ায় ৮১৬ টাকা। তার থেকে ছাঁট বাবদ ৪০.৮০ টাকা ও পণ্য খরচ বাবদ ২০ টাকা, মোট ৬০.৮০ টাকা বাদ দিলে প্রকৃত মূল্য মিলছে ৭৫৫.২০ টাকা। উৎপাদন খরচের থেকে খুব সামান্যই বেশী হতে পারে। কারণ বর্তমান মরশুমে ১২০০ টাকা কুইন্টালের কম খরচে কোন চাষীই ধান উৎপাদন করতে পারেনি।

ধান সংগ্রহের বহু ঘোষণা, সরকারি দপ্তরে বহু ব্যস্ততা, নেতা-মন্ত্রীদের বহু তৎপরতার প্রচার হচ্ছে। কিন্তু ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ধান সংগ্রহের কাজ বর্ধমান তথা পশ্চিমবাংলার কোন ব্লকেই শুরু করা হয়নি। ধান সংগ্রহ যদি গরিব চাষীদের স্বার্থে করতে হয় তাহলে ডিসেম্বরের শুরুতেই ধান সংগ্রহ শুরু করা উচিত ছিল। কারণ ছোট চাষীরা মহাজনের ঋণ পরিশোধ ও পরিবারের জরুরী খরচের জন্য বাধ্য হয়ে ধান ওঠার সাথে সাথে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এসব রাজ্যের সরকারি কর্তাব্যক্তি এবং শাসক পার্টির নেতা-মন্ত্রীরা জানেন না এমন নয়। আসলে সরকার ধান সংগ্রহ করে প্রশাসনের ও সরকারের খাদ্যভাণ্ডারের প্রয়োজনে। আর প্রয়োজন মেটানোর সুযোগে নেতা-মন্ত্রী-আমলা ও মিল মালিকদের পকেট ভারী করতে না পারলে চলবে কি করে! তাই সরকার যখন বর্তমানে ১৫ জানুয়ারির পর বিভিন্ন ব্লকে ধান সংগ্রহ করার শিবির খোলার কথা বলছে তখন পশ্চিমবাংলার গ্রামের গরিব চাষীদের বেশীরভাগ ধান কম দামের পাকচক্রে ফড়ে মারফত মিল মালিকদের গুদামে চলে এসেছে। আর মিল মালিকরা নেতা, মন্ত্রী, আমলাদের উৎকোচ দিয়ে বেশী দামে সরকারি শিবিরে ধান দিয়ে সরকারি টাকা নয়ছয় করবে। কৃষকরা অলাভজনক দামে ধান বিক্রি করে ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করলেও শাসক নেতাদের কিছু যায় আসে না। বর্ধমান জেলায় তৃণমূল রাজত্বে ৬০ জনের বেশী কৃষক আত্মহত্যা করেছে। অথচ নেতারা মেলা, উৎসব করে চলেছেন। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের পূর্বস্থলী গঞ্জে তৃণমূলের বিধায়কের পরিচালনায় শিল্প ও কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হল। মেলার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেতারা শিল্প বা কৃষির উন্নয়ন নিয়ে বা ধান সংগ্রহ কেন হচ্ছে না সে ব্যাপারে কিছুই বললেন না। বরং বললেন তাদের দলের মধ্যে কারা তোলাবাজী করছে, কোন ভাল নেতাকে দলে গুরুত্বহীন করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে ও পরে বিভিন্ন সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতিটি ব্লকে ১টি করে হিমঘর তৈরী করা হবে, ব্লকে ব্লকে 'কিষাণ মাণ্ডি' করা হবে। প্রত্যেক কৃষককে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ঋণ দেওয়া হবে, কিষাণ মাণ্ডিতে কৃষকরা সরাসরি তাদের ফসল লাভজনক দামে বিক্রি করতে পারবেন, ন্যায্য দামে বীজ, সার ও কীটনাশক পাবেন, গ্রামীণ ফড়ে-দালাল ও মহাজন থেকে নিস্তার পাবেন।

বাস্তবে বহু ব্লকে কিষাণ মাণ্ডি করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অনেক জায়গায় বড় বড় বিল্ডিংও হয়েছে। কিন্তু এখনও কোথাও কিষাণ মাণ্ডিতে বাজার চালু হল না। তৈরী হল না একটিও হিমঘর। কোথাও হল না ভূপৃষ্ঠ সেচ। আর কৃষকরা ফড়ে-দালাল-মহাজন ও মিল মালিকদের খপ্পরে পড়ে লোকসানে ফসল বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন।

গত বছর যখন সব্জির যোগান কম থাকায় কিছুদিনের জন্য সব্জীর দাম বেশী হল, তখন তৃণমূল নেতারা নেত্রীর নির্দেশে সব্জীর গ্রামীণ পাইকারী বাজারে পুলিশ নিয়ে গিয়ে কৃষকদের থেকে ফড়েদের বেশী দামে সব্জি কিনতে বাধা দিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিবাদ করলে পূর্বস্থলীর কালেখাঁতলা বাজারে কৃষকদের লক্ষ লক্ষ টাকার সব্জী রাস্তায় ফেলে নষ্ট করে দেন এবং কৃষকদের গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দেয়।

অথচ এই বছর পূর্বস্থলীর ৬টি পাইকারি বাজারে যখন চাষীরা তাদের ফুল কপি, বাঁধা কপি ও অন্যান্য সব্জী উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে; তখন তৃণমূল নেতাদের কোন হেলদোল নেই। ১ বিঘা জমিতে ফুল কপি চাষ করতে হলে কম পক্ষে ১০০০০ টাকা খরচ হয়। ভাল ফলন হলে ৪০০০ কপি বাজারে আনা সম্ভব হয়। এবছর কখনও কখনও ১-২ টাকা হিসাবে পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। যদি বহুমুখী হিমঘর থাকত তাহলেও কিছুদিন সংরক্ষণ রেখে বিক্রি করার সুযোগ পেত। বর্তমানে ধান বিক্রি হচ্ছে বর্ধমানের বিভিন্ন ব্লকে ৬৮০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা বস্তা দরে; হুগলীতে ৬৬০ টাকা থেকে ৬৮০ টাকা দরে। ফলে কৃষকরা বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে। বিভিন্ন ব্লকে অবরোধ করছে। এসব নিয়ে তৃণমূল নেতাদের মাথাব্যথা নেই। উল্টে কিষাণ মাণ্ডি তৈরি করা নিয়ে তোলাবাজীর খবর প্রচারে আসছে। ইন্দিরা আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ, তপসীলিদের ভর্তুকি ঋণ, সংখ্যালঘুদের জন্য ঘর তৈরীর অনুদান এসব নিয়ে দলবাজী দালালী করতেই নেতারা ব্যস্ত।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন ১০০ দিনের কাজের এলাকা রাজ্যে মাত্র ১২৪টি ব্লকে সীমিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন মুখে যাই বলুক কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। সার, ডিজেলের ভর্তুকি তুলে নেওয়ার বিরুদ্ধেও তাদের পদক্ষেপ নেই। ইউরিয়ার দাম ইতিমধ্যে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব প্রশ্নেও এই সরকার নীরব।

মমতা সরকার পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদক মার্কেটিং আইনে সংশোধন বিল ২০১৪ পাশ করেছে। ঐ বিলে কিষাণ মাণ্ডি ও কৃষক বাজার থেকে কার্যত সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকার কিষাণ মাণ্ডির জন্য জমি সংগ্রহ করে দেবে। তারপর যে কোন কোম্পানি বাজারে কাঠামো তৈরি থেকে বীজ ফসল উৎপাদন বাজারজাত, আমদানি-রপ্তানি সবই করতে পারবে। রাজ্যের বহু ব্লকে কৃষক বাজার ও বৃহৎ কৃষক বাজারের নাম করে সরকার জমি অধিগ্রহণ করেছে এবং কোথাও কোথাও বিল্ডিংও তৈরী করা হয়েছে। বর্তমান বিল অনুযায়ী এই সব বাজার ব্যক্তিগত মালিক, বিভিন্ন কোম্পানী মানে বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলার মৎস্য চাষ, সমস্ত ধরণের কৃষি উৎপাদন বীজ, কৃষি পরিকাঠামো সবকিছু আমদানি-রপ্তানি, রাজ্য দেশ বা বিদেশের বাজারে পাঠানো বা বিদেশ থেকে নিয়ে আসার অধিকার এই বিলে কোম্পানীগুলোকে দেওয়া হয়েছে। সরকার কোম্পানী লাইসেন্স দেবে। কৃষকরা চাষ করে বাজারে তুললে দাম ঠিক করবে কোম্পানীগুলো। কোন বীজ বা সার দিয়ে চাষ হবে সব ঠিক করে দেবে কোম্পানীগুলো। কোম্পানীগুলো তাদের লাভের স্বার্থে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করবে। মোট কথা কৃষকদের ভাগ্য ও কৃষি ভবিষ্যৎকে পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাই এই মার্কেটিং বিল কৃষক এবং কৃষি বিরোধী। এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের স্বাধীন চাষাবাদের অধিকার রেখে সরকারকে কৃষি এবং কৃষকদের সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

- সজল পাল

নদীয়া জেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন

১১ জানুয়ারি এ ভি হাইস্কুলে নির্মাণ শ্রমিকদের নদীয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে তিন শতাধিক শ্রমজীবী মানুষের মিছিল নগর পরিক্রমা করে। মিছিলে আওয়াজ ওঠে—সেস আদায় দুর্নীতি বন্ধ কর। অবিলম্বে পেনশন তহবিল গঠন কর। শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে আমলাতান্ত্রিক হয়রানি বন্ধ কর। আদায়কৃত সেসের ৯৫ শতাংশ অর্থ নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। পুঁজির স্বার্থে শ্রম আইন বাতিল করা চলবে না। শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন নয় ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোল। দৃপ্ত মিছিল নগরে উষ্ণতার পরিবেশ তৈরী করে।

মিছিল শেষে শহীদ স্মরণে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি সুদর্শন বোস শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এ আই সি সি টি ইউ রাজ্য সম্পাদক বাসুদেব বসু, নির্মাণ ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কিশোর সরকার, সভাপতি প্রবীর দাস, সি পি আই (এম এল) নদীয়া জেলা সম্পাদক সুবিমল সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির জেলা সভাপতি ধনঞ্জয় গাঙ্গুলি, নির্মাণ ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক নীহার ব্যানার্জী সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলন মঞ্চ উৎসর্গ করা হয় প্রয়াত কমরেড বিভাস বসু স্মরণে। সুসজ্জিত বিশাল হলঘর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যায়। তিনজনের সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন সুদর্শন বোস, অমল তরফদার, শ্যামল দাস।

বিভিন্ন সংগঠনের রাজ্য স্তরের নেতৃবৃন্দ বর্তমান পরিস্থিতি ও আগামী কর্তব্যর পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য পরিবেশন করার পর খসড়া প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্য থেকে বেশ কিছু পয়েন্ট বেরিয়ে আসে। যেমন (১) সংগঠিত ইউনিয়নকে ভাঙ্গতে সরকারি দপ্তরে নোটিশ লাগানো হয়েছে, যে ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে নাম নথিভুক্তিকরণ করাতে হবে। (২) জেলায় পাশ বই ও পরিচয়পত্র নেই বলে দিনের পর দিন শ্রমিকদের ফিরিয়ে দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে, ফলে শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তিকরণ পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। (৩) তৃণমূল পোষিত ব্যক্তি এজেন্টের মারফত নাম নথিভুক্তিকরণের কাজ চালানো হচ্ছে। (৪) নির্মাণ শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও পাশবই তৃণমূল নেতারা কব্জায় রেখে মোটা টাকা ঘুষ চাইছেন। (৫) শ্রমিকদের প্রকল্পের অর্থ প্রদানে নানারকম আইনি জটিলতা সৃষ্টি করে অর্থ প্রদানে বিলম্ব করা হচ্ছে। শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের কাজ ইউনিয়ন মারফত প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে।

এর বিরুদ্ধে নীচুস্তর থেকে আন্দোলন গড়ে তুলতে এলাকা স্তরে দাবিসনদ নথিভুক্ত করে ব্লক/সহ শ্রমাধ্যক্ষ দপ্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন দিতে হবে। তারপর ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের প্রথমে ব্যাপক প্রচার করে জেলা জমায়েত করে ডি এল সি দপ্তরে গণ ডেপুটেশন কর্মসূচী নেওয়া হবে। উক্ত কর্মসূচীতে রাজ্য নেতৃত্বও উপস্থিত থাকবেন। এ ধরণের জোরালো আন্দোলনই প্রশাসনকে বাধ্য করতে পারে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

সম্মেলনের শেষ পর্বে ১৭ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্পাদক নীহার ব্যানার্জী, সভাপতি সুদর্শন বোস পুনর্নির্বাচিত হন।

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
"লিবারেশন"
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ২০০ টাকা

মোদীর আমেরিকা যাত্রা ও গ্যাট-চুক্তির পিতৃসত্য

দিল্লীর মসনদ দখলের কয়েক মাসের মধ্যেই মোদী তার দেশী-র চেয়ে বিদেশী ইমেজ গড়ে তোলার প্রতি অনেক বেশী মনযোগী। এক বঙ্গসন্তান নরেন্দ্র যদি হিন্দু ধর্ম বিজয়ের জন্য ইউরোপ-আমেরিকা পাড়ি দিয়ে থাকেন, এ যুগের নরেন্দ্র—যিনি নিজের ব্যবসায়ী ইমেজ সম্পর্কে যথেষ্টই গর্বিত—তিনি যে সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন তা স্পষ্টতই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নয়। তবে বিজয়ের উদ্দেশ্য না বিক্রয়ের—সে নিয়ে অবশ্যই আলোচনার আবশ্যকতা আছে—অবকাশও।

এদেশের কেন্দ্র অথবা রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা যখন ইউরোপ, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, জাপান ভ্রমণে যান তখন তার উদ্দেশ্য নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ থাকে না। কোথাও একটা ঐকমত্য তৈরিই আছে—সেটা হল পুঁজি টানা। এবং আরও একটা ঐকমত্য হয়ে আছে—যে টানাটানির খেলায় আমরা কোন শর্ত দেব না, দেওয়ার অধিকারী নই আমরা—কারণ আমরা ভিক্ষার্থী, পোষাকী ভাষায়—আমরা 'রিসোর্স-পুওর সেটিং'-এর বাসিন্দা। এই 'রিসোর্স-পুওর সেটিং' অভিধাটিও আবার বিশ্ব প্রভুদেরই দেওয়া! এবং এই রিসোর্স-পুওর সন্তানদের আদর্শ প্রতিনিধি মোদী!!

এই প্রেক্ষাপটে যখন আমরা দাঁড়িয়েই আছি তখন মোদীর আমেরিকা ভ্রমণের প্রাক্কালে ইউরোপ, আমেরিকার বণিককুল ভারতে বাণিজ্য সম্পর্কে নানা শর্তাবলী আগেভাগেই তৈরি রাখবে সেটাই স্বাভাবিক। আসুন, আমরা এমনি একটি বাচনের সঙ্গে পরিচিত হই।

মোদীর আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে ফার্মাসিউটিকাল রিসার্চ এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অফ আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী রড হান্টার হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকায় লিখলেন—''মোদী যদি নলেজ ইন্টেনসিভ (যথা বায়োফার্মাসিউটিকাল) ক্ষেত্রে পুঁজি টানার ব্যাপারে সিরিয়াস হন, তাহলে তার সরকারকে কতকগুলো প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

প্রথম প্রতিবন্ধকতা হল, মেধাসত্ত্ব অধিকার বিষয়ক আইন। বিশেষত বায়োফার্মাসিউটিকাল ক্ষেত্রে ভারতের আইন খুবই ক্ষতিকারক। সাম্প্রতিক সময়ে নব-আবিষ্কৃত অনেকগুলো ওষুধের ওপর প্রোডাক্ট যেগুলো ভারতের বাজারে পাওয়া যায়, মেধাসত্ত্ব (পেটেন্ট) অধিকার হয় নস্যাৎ করা হয়েছে, নয়তো অস্বীকার করা হয়েছে আঞ্চলিক শক্তি (আঞ্চলিক ফার্মা কোম্পানি) গুলোর স্বার্থে। আর এসব করা হয়েছে 'বাধ্যতামূলক লাইসেন্স' এবং পেটেন্টেড ওষুধের ওপর 'সরকারি অনুমোদন' ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে। ভারতের দিক থেকে স্পষ্টীকরণ করতে হবে যে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স শুধুমাত্র প্রকৃত (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী) হেল্‌থ ইমার্জেন্সিগুলোর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হবে এবং ওষুধ অনুমোদনের পদ্ধতিগুলো ঢেলে সাজানো হবে।"

বুঝুন কাণ্ড! ওরা আপনার দেশে আসবে মাল বেচতে, কিম্বা কিছু প্রোডাকশনও হয়ত করবে—কিন্তু তার পূর্বশর্ত হবে যে সেটির মাস প্রোডাকশন করার ছাড়পত্র কোন এদেশী কোম্পানিকে দেওয়া যাবে না! আপনার দেশের মেধাবী টেকনোক্রাটরা ঐসব মাল (জেনেরিক মলিকিউল) তৈরি করতে পারবে না দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিকে—ঐ প্রোডাক্টটাই হবে পেটেন্ট আওতাভুক্ত—যার পোষাকী নাম প্রডাক্ট পেটেন্টিং।

অথচ টেকনোলজির যুগের বৈশিষ্ট্যই হল যে খুব দ্রুতই নতুন পদ্ধতিতে পণ্যগুলো প্রোডাকশনের রাস্তা আবিষ্কার করা সম্ভব এবং তা হয়েও থাকে। উৎপাদনের পদ্ধতি যদি অন্য হয়, সেক্ষেত্রে অন্য কারোর সেই প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে কোন বাধা থাকার কথা নয়। পেটেন্টিং-এর এই প্রকরণটার নাম প্রসেস পেটেন্টিং। প্রসঙ্গত, এদেশের ফার্মা কোম্পানিগুলোর বৃদ্ধি-বিকাশ যা হয়েছে সেটা এই পথেই। বিশ শতকের শেষের দিকে এর সুযোগ নিয়েই দেশের ওষুধ-বাজার কিছুটা হলেও বিদেশী বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়।

রড-এর মতে ''দ্বিতীয় বাধার জায়গাটা হল এদেশের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাটাই। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও ওষুধ অনুমোদনের ব্যবস্থাগুলো প্রায়শই খুব অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত। ওষুধ অনুমোদনের আবেদনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলোকে অনেক সহজ সরল করতে হবে এবং ওষুধ রিভিউ-এর মান আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করে তুলতে হবে।" অর্থাৎ এখানেও বিদেশী কোম্পানিগুলোর স্বার্থ স্পষ্ট। কোন নতুন ওষুধ বাজারে ছাড়ার উপযোগী করে তুলতে যে হিউম্যান ট্রায়ালের দরকার হয় তার জন্য হিউমান-গিনিপিগ সস্তায় আমাদের মত গরিব দেশ ছাড়া আর কোথায়ই বা পাওয়া যায়! সুতরাং এটাও যেন সহজলভ্য হয়—এই আর কি!

এখন এসব বাচনের সারার্থ বুঝতে এদেশের ওষুধ-বাজার, তার ওপর বিদেশী নিয়ন্ত্রণ এবং পেটেন্টিং সংক্রান্ত কিছু আলোচনা দরকার। আমরা সেদিকে কিছুটা নজর দিতে পারি।

গল্পটা শুরু হতে পারে ব্রিটিশ ভারতেই।

পরাধীন ভারতে ওষুধের দাম ছিল অত্যন্ত চড়া, ইউরোপের বাজারের সঙ্গে তুলনীয়। বিদেশী বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোই ছিল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। যদিও তখন এদেশে উৎপাদনের বদলে বিদেশী কোম্পানিগুলোর তাদের স্বদেশ থেকে এদেশে ওষুধ বিক্রি করাই ছিল মূল প্রবণতা। ১৯১১ সালের উপনিবেশিক পেটেন্ট অ্যাণ্ড ডিজাইন অ্যাক্ট মোতাবেক, ১৯৪৭-৫৭-এর পর্যায়কালে ভারতের বাজারের জন্য মোট ১৭০৪টি পেটেন্টের ৯৯ শতাংশই ছিল বিদেশী কোম্পানিদের দখলে। যদিও ইতিমধ্যে দুটো বড় ওষুধ কোম্পানি গড়ে উঠেছিল সরকারি উদ্যোগে—১৯৫৪ সালে হিন্দুস্তান অ্যান্টিবায়োটিক লিমিটেড (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ-এর সহায়তায়) এবং ১৯৬১ সালে আই ডি পি এল (সোভিয়েত সহায়তায়) এবং তারা পেনিসিলিন সহ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, ম্যালেরিয়ার ওষুধ ইত্যাদির মাস প্রোডাকশন শুরু করে তবু ঐ শতকের একেবারে সত্তর দশক পর্যন্ত পরিস্থিতির কোন বড় পরিবর্তন ঘটেনি।

১৯৭০-এর পেটেন্ট অ্যাক্ট এবং ১৯৭৮-এর ড্রাগ পলিসি পরিস্থিতিতে একেবারে নতুন মোড় নিয়ে আসে—যার ফলশ্রুতিতে ওষুধ উৎপাদনে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই হয়ে উঠল না রপ্তানি বাজারেও নিজের উপস্থিতি জাহির করতে শুরু করল। এবং এই পরিবর্তনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল ভারতীয় মেধা তথা বৈজ্ঞানিকরা। তাঁরা ঐ পর্যায়ে ১০৭টা ওষুধ মলিকিউল উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেন। আর এসবেরই সুবাদে, ইউনাইটেড নেশানস ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের মতে ভারতবর্ষ নিজের প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় টেকনোলজি ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে নিতে পেরেছে। ১৯৭০-এর পরবর্তীতে আজ প্রায় ২৩ হাজারের মত ছোট, মাঝারি ও বড় স্বদেশী ওষুধ কোম্পানি এদেশে উৎপাদন করছে। অবশ্যই সে সময় ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট বলবৎ ছিল, যার সাহায্যও ঐসব কোম্পানিগুলো পেয়েছিল।

বর্তমান প্রসঙ্গে এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারতের যোগদান, ১৯৯৫-এর শুরুতে। সর্বনাশের শুরু তখনই। একদিকে পেটেন্টিং পদ্ধতিটা বদলে গেল। আগের প্রসেস পেটেন্টিং-এর বদলে এল প্রডাক্ট পেটেন্টিং এবং পেটেন্টের সময়কাল বেড়ে হল ৫-৭ বছর থেকে ২০ বছর। কিন্তু তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল আসার আগেই ওষুধের দাম বাড়তে লাগলো লাফিয়ে লাফিয়ে।

ভারতবর্ষ গরিব দেশ বলে এখানে টিবি রোগের প্রকোপ বেশী। আর এই টিবির ওষুধেরই দাম বেড়ে গিয়েছিল ২ থেকে সাড়ে পাঁচগুণ, ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ এই তিন বছরের মধ্যে। সেই সময় ফেডারেশন অফ মেডিক্যাল অ্যাণ্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস অফ ইণ্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক ডি পি দুবের কিছু আশঙ্কা প্রণিধানযোগ্য। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ডব্লিউ টি ও জমানায় শুধু পেটেন্ট আইনই বদলাবে না, এর ফলে দেশের ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাটাই ক্রমে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকা থেকে মোদী যা শুরু করলেন তাতে এই আশঙ্কাই বড় হয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

ভারতবর্ষ গ্যাট চুক্তিতে সই করার পর প্রায় দু-দশক হতে চললো। ১৯৯৫ সালে স্বাক্ষর করলেও প্রোডাক্ট পেটেন্ট সম্বলিত নতুন পেটেন্ট আইনটি বলবৎ হল ২০০৫ সালের মার্চে। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সেটি ধ্বনিভোটে সংসদে পাশ করালেন। সস্তা ওষুধের জন্য লবি করেন, এমন সংস্থাগুলো অশনি সংকেত দেখলেন। বিরুদ্ধ প্রচার চালালেন, কিন্তু সরকার ডব্লিউ টি ও-র পথে অনড়।

এতদসত্ত্বেও কিন্তু এখনও ভারতীয় ফার্মা কোম্পানিগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী। আজও তার সামগ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এবার বোধহয় তাদের কপালে দুঃখ আসছে। চুক্তি যাই হোক, চুক্তি যখনই হোক, পুঁজির গতি নির্ধারিত হয় পুঁজির নিজের প্রয়োজনে। সেই প্রয়োজনটা বোধহয় সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে। মোদীর আমেরিকা সফর এবং পলিসি রিফর্মগুলো এই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই দেখা দরকার।

সম্প্রতি বহুজাতিক ওষুধ সংস্থাগুলো তাদের প্রোডাক্ট আউটসোর্স করতে চাইছে ভারতবর্ষ সহ নানা গরিব দেশে। নতুন এই বিজনেস মডেলটার নাম কন্ট্রাক্ট রিসার্চ অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং সার্ভিস বিজনেস। এতে বহু ভারতীয় কোম্পানি ইতিমধ্যেই যোগ দিতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে নতুন প্রবণতা হল বড়মাত্রায় মার্জার-অ্যাকুইজিশন এবং কোম্পানিগুলোর আত্মবিক্রয়। ফেরা (ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট)-বিহীন জমানায় এদেশের খোলা হাওয়ায় যেসব বিদেশী ফার্মা কোম্পানি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসছে, তাদের কাছে। তবে কেউ যদি প্রশ্ন করেন, পুঁজি তো পুঁজিই—তা দেশী হোক বা বিদেশী কি আসে যায়? প্রশ্নটা ফেলে দেওয়ার নয়। শেয়ার বাজার যারা করেন, তারা জানেন যে ফার্মা কোম্পানি, তা সে দেশী হোক বা বিদেশী, হল লাভের গ্যারান্টি। তবে ভয়টা শেয়ার হোল্ডারদের ততটা নয়, যতটা সাধারণ মানুষের। কারণ সব মিলিয়ে ব্যবসার নিয়ন্ত্রণটা বিদেশী কোম্পানিদের হাতে গেলে দামের নিয়ন্ত্রণটাও যাবে। কারণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ-কাঠামোয় তাদের বেঁধে ফেলা অনেক কঠিন। আর এসব কিছুকে খানিকটা কাউন্টার-ব্যালান্স করতে পারতো যারা, সেইসব রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি, যেগুলোর উল্লেখ আগে করা হয়েছে, তারা তো এখন বি আই এফ আর ঘুরে, জায়েন্ট থেকে মুষিকে পর্যবসিত। দশচক্রে (পড়ুন আদর্শহীন পপুলিস্টি রাজনীতির চক্রে) ভগবানও ভূত হয়, এগুলো তো নেহাৎ কোম্পানি!

অতি সম্প্রতি মোদী সরকার ওষুধ বাজারের দাম নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন বলেই মালুম হয়। ২০১২ সালে, মূলত পপুলিস্ট রাজনৈতিক কারণেই মনমোহন সিং-এর সরকার ৩৪৮টি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। মোদী সরকারও জুলাই ২০১৪-তে আরও ১০৮টি ওষুধকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে এলেন।

কিন্তু আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে মোদী আচানক পেণ্ডুলামের মত একেবারে বিপরীত মেরুতে ছিটকে গিয়ে কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা, ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি-র হাত থেকে নিয়ন্ত্রণের অধিকারটাই কেড়ে নিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্য চিরকালই কল্পনার চেয়ে অদ্ভুত!

গ্যাটের জমানায়, এফ ডি আই-এর জমানায় আবার ভারতীয় কোম্পানিগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী বিদেশী কোম্পানিদের সাবসিডিয়ারিতে পরিণত হবে, ভারতীয় মেধাসত্তা ধর্ষিত হবে আবার, যেমন বহুবার হয়েছে। তার ছাপ পড়বে ওষুধ বাজারে। কিন্তু তার বহু আগেই আমেরিকানরা চাইছে অন্য পথে আরও আশু ফলাফল। ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোই তুলে দাও। তাই গ্যাট চুক্তির সময় করা দুবেজীর আশঙ্কাটাই সাকার হতে চলেছে। নাপা তথা অন্য নিয়ন্ত্রক-নিয়ামক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকরী করে দেওয়া, কালে দিনে এটাই প্রবণতা। ডব্লিউ টি ও আমলে স্বভাবতই সরকারগুলো মিনিম্যালিস্ট সরকারে পরিণত হচ্ছে, হবে। এমন পরিস্থিতিতে জনগণকেই প্রতিবাদে-প্রতিরোধে ম্যাক্সিম্যালিস্ট হয়ে উঠতে হবে—নান্যোপায়ম।

- অনিন্দ্য সেন

অতি সম্প্রতি মোদী সরকার ওষুধ বাজারের দাম নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন বলেই মালুম হয়। ২০১২ সালে, মূলত পপুলিস্ট রাজনৈতিক কারণেই মনমোহন সিং-এর সরকার ৩৪৮টি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। মোদী সরকারও জুলাই ২০১৪-তে আরও ১০৮টি ওষুধকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে এলেন।

প্যারিস হামলাকে ধিক্কার জানান, ইসলাম-আতঙ্ককে প্রতিহত করুন এবং ‘বাক স্বাধীনতা’ নিয়ে কপটতাকে উন্মোচিত করুন

প্যারিস থেকে বার হওয়া শার্লি এবদোর সাংবাদিক ও কার্টুন শিল্পীদের গণহত্যা অত্যন্ত ঘৃণ্য ঘটনা এবং তাকে ধিক্কার জানাতে হবে। প্যারিসে সংঘটিত গণহত্যার মত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ইসলাম-আতঙ্ক নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারের রসদ হয়েই উঠতে পারে, যুদ্ধ, দখলদারি ও দমনের সমর্থনে যে প্রচারকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্যারিসে আক্রমণের পাশাপাশি ইসলাম-আতঙ্ক অনুপ্রাণিত আন্দ্রে ব্রেভিকের হাতে নরওয়ের গণহত্যা, সলমান রুশদিকে হুমকি; বাংলাদেশ ও ভারতে তসলিমা নাসরিনের নিগ্রহ; পেশওয়ার গণহত্যা; এম এফ হুসেনের নিগ্রহ যার ফলে তিনি ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন; হিন্দুত্ব গোষ্ঠীগুলোর হুমকির ফলে ওয়েণ্ডি ডনিগারের বইকে তুলে নেওয়া; যে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে পি কে ছবিটি প্রদর্শিত হচ্ছিল সেগুলোতে ভাঙচুর চালানো এবং তামিল লেখক পেরুমল মুরুগানকে চোখ রাঙিয়ে ‘লেখক হিসাবে মৃত’ ঘোষণায় তাঁকে বাধ্য করা—এগুলো সবই ধর্মীয় উন্মত্ততা ও বিদেশী আতঙ্কের নামে হিংসা ও সন্ত্রাসবাদের দৃষ্টান্ত। বহু সরকারের হাতে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইজরায়েল, ফ্রান্স, ভারতের মত) বিরোধী মতামত পোষণকারী রাজনৈতিক সাংবাদিক, সরকারের কুকীর্তি ফাঁসকারী, লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা ইত্যাদিদের নিগ্রহের অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এমন কার্টুন শিল্পী, লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা বা শিল্পীর বিরুদ্ধে হিংসা বা নিষেধাজ্ঞা জারির দাবির কোন স্থান গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না যে, কোন লেখা, শিল্প বা চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হওয়া, বিরোধিতা প্রকাশ করা বা প্রতিবাদ জানানোর অধিকার সবারই আছে। কিন্তু এই সমস্ত বিরোধিতা প্রকাশ করতে হবে লেখা, শিল্প, চলচ্চিত্র বা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমে। হুমকি, বাস্তব হিংসা বা নিষেধাজ্ঞা গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেই খর্ব করে তোলে।

তবে শার্লি এবদোর কর্মীদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানোর অর্থ কখনই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনগুলোর বিষয়বস্তুকে মেনে নেওয়া নয়। একথা সত্যি যে, শার্লি এবদো এমন সমস্ত কার্টুন ছেপেছে যার উদ্দেশ্য খ্রীষ্টধর্ম সহ অন্যান্য ধর্মকে ‘আঘাত দেওয়া’। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে হজরত মহম্মদের ছবি ছাপাটাই যে শার্লি এবদোয় ছাপা কার্টুনগুলোকে আপত্তিজনক করে তুলেছে এমন নয়। প্রকৃত ঘটনা হল, শার্লি এবদোয় ২০০১ থেকে যে সমস্ত কার্টুন ছাপা হয়েছে তার ভালো সংখ্যকই হল বর্ণবাদী, নারী-বিদ্বেষী, ইসলাম-আতঙ্কর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। গোটা বিশ্বেই ইসলাম-আতঙ্ক ভয়ঙ্কররূপে তীব্র হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে সেই বছরগুলোতে ফ্রান্সে তা অভিবাসী-বিরোধী বিদেশাতঙ্ক ভিত্তিক রাজনীতি এবং ঘৃণা-চালিত হিংসার রূপে সামনে আসে। এই পটভূমিতে শার্লি এবদোয় ছাপা দাড়ি রাখা ও বোরখা পরার জন্য মুসলিমদের ব্যাঙ্গ করে যে কার্টুনগুলো ছাপা হয় এবং সেগুলোতে মুসলিম পুরুষ ও নারীদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর লিঙ্গগত হিংসা এবং কল্যাণমূলক সুবিধা পাওয়া মুসলিম নারীদের বিরুদ্ধে পুরুষতান্ত্রিক মন্তব্য করা হয়, সেগুলোকে নিম্নরুচির বর্ণবাদ ও বিদেশাতঙ্ক থেকে আলাদা করা যায় না। তারা যে দাবি করে থাকে তার বিপরীতে শার্লি এবদোর কার্টুনগুলোকে কখনই বামপন্থী কালাপাহাড়ি বা নিরিশ্বরবাদী অশ্রদ্ধার মর্যাদা দেওয়া যায় না। অলিভার সাইরান এই গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার আগে রচিত তাঁর একটি নিবন্ধে ৯/১১ পরবর্তী পর্যায়ে শার্লি এবদো চূড়ান্তরূপে বর্ণবাদী, ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে ওঠায় তার তীব্র সমালোচনা করেন।

ফরাসি রাষ্ট্রের সরকারি ‘ধর্মনিরপেক্ষতাও’ শার্লি এবদোর যে সমস্যা তাতে জর্জরিত। ফ্রান্স হিজবের উপর বা ‘সুস্পষ্টরূপে লক্ষণীয়’ ধর্মীয় প্রতীকগুলোর উপর (যার ব্যাখ্যায় বিন্দি বা পাগড়িকেও বোঝানো যায়) যে নিষেধাজ্ঞা জারি করে—ফ্রান্স যাকে তার উৎকৃষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে দাবি করে থাকে—তা বিদেশাতঙ্ক থেকে ঐ প্রতীকগুলোকে কলঙ্কিত করা ও সেগুলোর উপর আক্রমণের সমসময়েই ঘটে। যাঁরা বিন্দি, বোরখা ও পাগড়ি ধারণ করেন, ইউরোপের অনেক দেশে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের যখন ‘বুদ্ধু’, ‘পাগড়িওয়ালা’ ইত্যাদি বলে কলঙ্কিত করা হয় তখন এই প্রতীকগুলো ধারণ করা তাঁদের পরিচিতি ও মর্যাদা রক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই প্রতীকগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করাটা ধর্মনিরপেক্ষতা ও নারীবাদের আবরণে বর্ণবাদকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া! ভারতের এক প্রথম সারির দৈনিকে শার্লি এবদো সম্পর্কে প্রকাশিত এক নিবন্ধে দাবি করা হয় যে, ঐ পত্রিকা ‘ইসলাম বিরোধী হওয়ার বদলে ধর্ম বিরোধী’ এবং ঐ সংবাদ পত্রে মন্তব্য করা হয়, অভিবাসীদের ক্রমবর্ধমান ভিড় এবং ‘‘ফ্রান্সের পূর্বতন উপনিবেশগুলো থেকে আগত কালো মানুষদের ফরাসি নাগরিক হয়ে ওঠাটা’’ ‘‘ফরাসি পরিচিতির উপর যথেষ্ট চাপ’’ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বৈচিত্র এবং ফ্রান্স যে সমস্ত দেশগুলোকে তার উপনিবেশে পরিণত করেছিল সেখান থেকে মানুষদের ফ্রান্সে চলে আসার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ পরিচিতি যদি ‘‘চাপের’’ মধ্যে পড়ে তাহলে ঐ ধরণের ‘ধর্মনিরপেক্ষতার’ মধ্যেই কি যথেষ্ট গলদ নেই? ফ্রান্স যদি তার পূর্বতন উপনিবেশগুলোর প্রজাদের অর্থাৎ ‘ওদের’ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আত্ম-অভিব্যক্তিকে মানিয়ে নিতে না পারে তাহলে সেটাকে কি আদৌ ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বলা যায়?

সাধারণভাবে ফ্রান্সে এবং শার্লি এবদো পত্রিকায় বাক স্বাধীনতা অবাধ বলে যে দাবি করা হয়ে থাকে তা মিথ্যা। ফ্রান্সে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে সেমিটিক জাতি বিরোধী ঘৃণার বচন আইনত নিষিদ্ধ। শার্লি এবদো কর্তৃপক্ষ তার এক কর্মীর বিরুদ্ধে প্রতারণামূলকভাবে সেমিটিক-বিরোধিতার অভিযোগ এনে তাঁকে বরখাস্ত করে এবং সেই অভিযোগ এই ভিত্তি আনা হয় যে তিনি ফ্রান্সের এক রাজনীতিবিদ অর্থের জন্য এক ইহুদি উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করেছেন বলে তাঁকে উপহাস করেছেন। কিন্তু যখন তাঁদের পোষাক বা গায়ের রঙের জন্য মুসলিম বা অভিবাসীদের উপহাস করা হয়, যৌন হিংসার অশ্লীল প্রতীকে চিত্রিত করা হয়, ঐ একই পত্রিকা তখন সেই বিষয়বস্তুর মধ্যে বর্ণবাদ বা ইসলাম-আতঙ্কর কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। সমস্যাটা আসলে হল, ইসলাম-আতঙ্ক বা আরব-বিরোধী বিদেশী আতঙ্ককে ঘৃণার বচন বলে স্বীকার করার ব্যাপারে ফ্রান্সের অসামর্থ্য।

ফ্রান্সই যে বিশ্বের সর্বপ্রথম দেশ যে প্যালেস্তাইনের সপক্ষে প্রতিবাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সেটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এই সমস্ত প্রতিবাদের কয়েকটি যে সহিংস বা সেমিটিক-বিরোধী হয়ে উঠেছিল সেটা কোন যুক্তি হতে পারে না। ইসলাম-আতঙ্ক ভিত্তিক হিংসার অসংখ্য দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সে ইসলাম-আতঙ্ক-কেন্দ্রীক ‘আত্ম-অভিব্যক্তির’ উপর কোন নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ তো জারি হয়নি। সেমিটিক-বিরোধী হিংসার ক্ষেত্রে যেমন, ইসলাম-আতঙ্ক ও বিদেশী আতঙ্ক ভিত্তিক হিংসাকে প্রতিহত করা ও সেগুলোর সংঘটকদের শাস্তি দেওয়াও তেমনি ফরাসি রাষ্ট্রের উচিত ছিল এবং সম্ভবও ছিল। কিন্তু প্যালেস্তাইনের সপক্ষে প্রতিবাদকে নিষিদ্ধ করাটা ‘স্বাধীনতা’ এবং ‘অবাধ মত পোষণ’-এর পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা সম্পর্কে ফ্রান্সের দাবির চূড়ান্ত কপটতাকেই প্রতিপন্ন করে। ফ্রান্সে এক উগ্র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সমাজতত্ত্ববিদ সঈদ বউআমামা এবং র‍্যাপার (ঘুম ভাঙানিয়া) সঈডউকে বিচারের মুখোমুখি করানো হয়, তাঁদের অপরাধ তাঁরা ফ্রান্সের যুব শ্রমিক শ্রেণীর সংহতিতে এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে একটি বই ও কিছু গান প্রকাশ করেছিলেন। শার্লি এবদোর উপর আক্রমণের পর সঈদ ও সঈডউ এক বিবৃতিতে ফরাসি রাষ্ট্রের কপটতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ ও ইসলাম-আতঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। প্যারিসে সংঘটিত আক্রমণের বিরুদ্ধে অধিকাংশ দেশের সরকারের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়া যেমন তাদের কপটতাকে প্রকাশ করে, তার মধ্যে আবার ইসলাম-আতঙ্ককে জোরদার করে তোলার তাদের দুরভিসন্ধিও পরিলক্ষিত হয়। ঐ ধরণের কপটতাকে উন্মোচিত করে একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, ‘‘সি আই এ-র ধারাবাহিক অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে একমাত্র যে ব্যক্তিটি জেলে রয়েছেন তিনি হলেন জন কিরিয়াকউ যিনি তাদের কুকীর্তিকে ফাঁস করেছেন। ফোনে গণ নজরদারির খবর ফাঁস করে দেওয়ার জন্য এডওয়ার্ড স্নোডেনকে তাড়া করে বেড়ানো হচ্ছে। উইকিলিকস আখ্যানে তাঁর ভূমিকার জন্য চেলসি ম্যানিংকে ৩৫ বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে’’। ইন্টারনেটে তোলা এক কার্টুনে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নিতানিয়াহুর কপটতাকে উন্মোচিত করে তার শিরোনামে বলা হয়েছে, ‘‘আমি গত গ্রীষ্মেই গাজায় যে ২১৩৪ জন প্যালেস্তিনিয়কে খতম করেছি তার মধ্যে ১৭ জন সাংবাদিক। আজ প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশে প্রথম সারিতে হেঁটে আমি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করেছি।’’

প্যারিস ঘটনাকে ধরে ভারত থেকে ব্যক্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ভুরি ভুরি কপটতা রয়েছে। সংঘ পরিবার প্যারিস হত্যাকাণ্ডকে ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করে। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সংঘ পরিবার এবং অন্যান্য হিন্দুত্ব গোষ্ঠীগুলো নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ‘‘রক্ষা’’র নামে অসংখ্য ভয়াবহ হিংসাকাণ্ড চালানোর জন্য দায়ী। এই হিংসাকাণ্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে এম কে গান্ধী হত্যা, গ্রাহাম স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, মুসলিম ও খ্রিষ্টান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বহু সংখ্যক হত্যাকাণ্ড এবং লেখক ও শিল্পীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হুমকি যার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত হল ওয়েণ্ডি ডনিগার, পেরুমল মুরুগান, রোহিন্টন মিস্ত্রি, এ কে রামনুজম-এর রচনা এবং আনন্দ পট্টবর্ধন নির্মিত চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে; মুম্বাইয়ের দুটি মেয়ের ফেসবুকে তোলা মন্তব্য, এম এফ হুসেনের শিল্পর বিরুদ্ধে। যে আন্দ্রে ব্রেভিক নরওয়েতে বহু যুবক-যুবতীদের হত্যা করে সে অনেকটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল ভারতের সংঘ পরিবারের মতাদর্শ ও তাদের সহিংস কার্যকলাপ থেকে। মোদী সরকার জমি গ্রাস বা বনভূমি ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কর্পোরেটপন্থী উন্নয়নের বিরুদ্ধে এক ধরণের ‘ঈশ্বরনিন্দা’ বলেই মনে করছে এবং এই সেদিন তারা এই যুক্তিতেই আন্দোলনের এক কর্মীকে দেশের বাইরে চলে যেতে বিমানে চড়তে দেয়নি।

প্যারিসে আক্রমণের ঘটনাকে পশ্চিমি ‘গণতন্ত্র’র মূল্যবোধ এবং ‘বাক স্বাধীনতা’র উপর ইসলামের আক্রমণের এক চক্রান্তে পরিণত করা এবং ইসলাম-আতঙ্কর ও ইসলাম-বিরোধী ঘৃণাকে উসকিয়ে তোলার—ঠিক ৯/১১-র ঘটনাকে যেমনভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল—যে কোন প্রচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে রুখতে হবে। এই আক্রমণ যে ঘৃণ্য, ভয়াবহ ও বিবেকহীন সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এই অপরাধকে কিন্তু সেই সমস্ত শক্তির দ্বারা মানবতা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধকে আড়াল করতে ও তাকে ন্যায্য করে তুলতে দেওয়া যাবে না, যে শক্তিগুলোই এখন ‘গণতন্ত্র’র রক্ষকের ভেক নিয়ে সামনে আসছে। আই এস আই এস, তালিবান, বোকো হারাম এবং এই ধরণের গোষ্ঠীগুলো যেমন গণতন্ত্রের সামনে বিপদ, তেমনই বর্ণবাদ, ইসলাম-আতঙ্ক, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ ও দখলদারির এবং তার সাথে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সমালোচকদের দমনমূলক কণ্ঠরোধ গণতন্ত্রের সামনে প্রকৃত ও বিদ্যমান বিপদ।

প্যারিসে আক্রমণের ঘটনাকে পশ্চিমি ‘গণতন্ত্র’র মূল্যবোধ এবং ‘বাক স্বাধীনতা’র উপর ইসলামের আক্রমণের এক চক্রান্তে পরিণত করা এবং ইসলাম-আতঙ্কর ও ইসলাম-বিরোধী ঘৃণাকে উসকিয়ে তোলার—ঠিক ৯/১১-র ঘটনাকে যেমনভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল—যে কোন প্রচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে রুখতে হবে। এই আক্রমণ যে ঘৃণ্য, ভয়াবহ ও বিবেকহীন সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এই অপরাধকে কিন্তু সেই সমস্ত শক্তির দ্বারা মানবতা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধকে আড়াল করতে ও তাকে ন্যায্য করে তুলতে দেওয়া যাবে না, যে শক্তিগুলোই এখন ‘গণতন্ত্র’র রক্ষকের ভেক নিয়ে সামনে আসছে। আই এস আই এস, তালিবান, বোকো হারাম এবং এই ধরণের গোষ্ঠীগুলো যেমন গণতন্ত্রের সামনে বিপদ, তেমনই বর্ণবাদ, ইসলাম-আতঙ্ক, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ ও দখলদারির এবং তার সাথে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সমালোচকদের দমনমূলক কণ্ঠরোধ গণতন্ত্রের সামনে প্রকৃত ও বিদ্যমান বিপদ।

সময়টা কি 'দুর্বোধ্য'!

পশ্চিমবঙ্গের সময়টা যা যাচ্ছে দুর্বোধ্য! চিন্তা কি এভাবেই প্রতিভাত হচ্ছে বিশেষ করে যারা ঘুম ভাঙানিয়া নাগরিক সমাজের তাদের মধ্যে? যারা বিবেকবান, মননশীল, জেগে থাকা, ন্যায়-নীতি-নৈতিকতাবাদী, প্রগতিবাদী, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমী—এঁদের দিক থেকে? সময় কি কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিচ্ছে? সেরকমই দৃষ্টি আকর্ষণ যেন করাতে চাইলেন মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক শিক্ষক। এক বাংলা দৈনিকে তার উপস্থাপিত বক্তব্য হল, 'দুর্বোধ্য সময়ের মুখোমুখি নাগরিক সমাজ' (আনন্দবাজার ৬ জানুয়ারি '১৫)। ঐ প্রতিবেদনের সবশেষে নৈতিক প্রতিবাদী অবস্থান নেওয়া পছন্দ করা নাগরিক সমাজের মনোভঙ্গীকে সারসত্যে ধরার একটা চেষ্টা থেকেছে। বলা হয়েছে, 'এক দুর্বোধ্য সময়ের মুখোমুখি বাংলার নাগরিক সমাজ। তৃণমূলের প্রতি তার আস্থা তলানিতে ঠেকেছে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের স্মৃতি এখনও টাটকা, তাই আগের মতো সরকারি বামপন্থার পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া অধিকাংশের পক্ষেই এখনই সম্ভব নয়, কংগ্রেসের কোনও আশা নেই, আর সদ্যোত্থিত বিজেপি সম্পর্কেও থেকে যাচ্ছে একগুচ্ছ অস্বস্তিকর প্রশ্ন। কীভাবে সামাজিক নৈতিকতার বাহকরা এই দ্বন্দ্ব পার হন এবং বাকিদের পথনির্দেশ দেন, সেদিকেই ২০১৫ চেয়ে থাকবে'।

ঐ প্রতিবেদনের নির্যাস নিয়ে বিতর্ক চালানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং এই সূত্রে আলোচনায় শরিক হওয়া যেতে পারে।

এরাজ্যের পরিস্থিতি সত্যিই পরপর চমকে দিয়ে চলেছে। ২০১১-র পালাবদলের পর অপ্রত্যাশিত সত্বরই ফের ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়ে যেতে শুরু করেছে। এ ভাঙ্গন যেমন নাগরিক সমাজের সংবেদনশীল অংশগুলো প্রত্যক্ষ করছে, তেমনি শ্রেণীশক্তি ও সম্প্রদায়গুলোও নজর করছে। আর, রাজনৈতিক শক্তিগুলোও যেমন যেমন পারছে প্রভাবিত করার ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কোনোকিছুই শূন্য থাকে না, থাকছে না।

২০১১-র কেল্লা মার উপভোগ করার বদলে তৃণমূলকে এখন আগামী ২০১৬-র অগ্নিপরীক্ষার কথা ভাবাচ্ছে। তার আগে ২০১৫-র পুরসভা নির্বাচনগুলো রয়েছে। কোনো ব্যাপারেই ভাগ্যগণনা করে উঠতে পারছে না। সামাজিক আবেগের হাওয়ায় নিশ্চিত থাকার দিন শেষ। এখন সময়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে কেবল সমীকরণ কষে। চোখের সামনে সাড়ে তিন দশকের একটা সংস্কারবাদী 'বাম' সরকারের উত্থান-পতনের নজীর রয়েছে। কিন্তু তুলনায় কোনো ইতিমূলক গণতান্ত্রিক মৌলিক সংস্কারের সূচনাই করা হল না। গ্রামীণ ক্ষেত্রে নজর কাড়ার একমাত্র যে ঝোলাটি নামানো হয়েছে তা হল, কয়েকটি ক্ষেত্রবিশেষে ২ টাকা কিলো চাল বিতরণের। ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের ওপর কেন্দ্রের মোদী সরকারের কোপ এবং জমি অর্ডিন্যান্স নিয়ে মমতা সরকারের হৈ হল্লা শুধু বহিরঙ্গেই। নিজেরা করিয়েছে বছরে সর্বোচ্চ ৩৫ দিন মাত্র। ১০০-য় ৩৫ করে প্রথম স্থানাধিকারী। পলিসি নেওয়া হল, কৃষিমাণ্ডি নির্মাণ হবে পিপিপি মডেলে, মানে কৃষিপণ্যের মজুতদারি ও ব্যবসার হাটবাজার খুলে দেওয়া হবে বড় বেসরকারি পুঁজির কাছে। কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনের দৌলতে মওকা মিলেছে শাসন ক্ষমতায় চড়ে বসার, সেই বাধ্যতায় কর্পোরেটমুখী খুল্লামখুল্লা জমি হস্তান্তর নীতিতে বাধো বাধো লাগছে। কিন্তু শিল্পমালিকরা সরাসরি কৃষিজমি কিনতে চাইলে সরকারের আপত্তির পলিসি নেই। কৃষিজমির সংরক্ষণ নিয়ে কোন জোরালো সরকারি নীতি নেই। গুচ্ছের উপনগরী নির্মাণের যে পলিসি নেওয়া হয়েছে তাতে কৃষিজমিতে কত থাবা মারা হবে তা নিয়েও থাকছে যথেষ্ট শঙ্কা। একটা দুর্গন্ধী স্বৈর শাসনের ঢাল হিসাবে সুবেশের বলয় রচনার রসদ পেতে তৃণমূল মজুদ বাহিনী বানানোর ঘাঁটি করেছে টলিউড-টেলিউডকে। কায়েম করেছে শাসক-প্রযোজক-পরিবেশক আঁতাতের সন্ত্রাস। আজ্ঞাবহ না হলে রুজিতে মারার ভয় দেখানো চলছে। সংস্কারের যে'কটি ঝুলি উপুড় করা হয় তা কেবল ভোট ব্যাঙ্কের হিসেব কষে। কিছু কিছু ভাতা দান ও অনুদান। তা সত্ত্বেও তৃণমূলের তাঁবেদারিতে বেঁধে তৃণমূলত্বের রাহুগ্রাসে গিলে ফেলার কি পরিণাম সেটাও লক্ষ্যণীয়। ভেতরকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বের চাপে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গল তৃণমূলের 'নাট্যস্বজন'-এর। গলায় সারদার কাঁটা। নেতা-মন্ত্রীদের একের পর এক অভিযুক্ত হতে হচ্ছে, থানা-হাজতে ঢুকতে হচ্ছে। নাগরিক সমাজের কোথাও থেকে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি মিলছে না, একদা ঘনিষ্ঠ সহচররা সব সরে যাচ্ছেন, জুটছে কেবল কিছু উৎকোচ-প্রলোভনের কাছে মাথা বিকোনো ধূয়ো তোলার দল। খাগড়াগড়কাণ্ড প্রসঙ্গেও তৃণমূল না পারছে রহস্যের কিনারা করার আন্তরিক দাবি তুলতে, না পারছে নিজেকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করতে। খাগড়গড়কাণ্ডকে বিজেপি ও তার ক্ষমতার কেন্দ্র মিলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির খাস স্বার্থে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করতে চাইছে সন্দেহ নেই। নাগরিক স্বার্থেই সবকিছুর নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা হচ্ছে কীনা তা নিয়েও নাগরিক সমাজে যথেষ্ট সন্দেহ থাকছে। কিন্তু নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের সারদায়-খাগড়ায় একইসাথে। এর মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারছে না তৃণমূল।

এই পরিস্থিতিতে বঙ্গীয় নাগরিক সমাজের প্রতিবাদী মানসিকতার সকলেই যে চুপ মেরে গেছেন তা নয়। অনেকেই ইতিপূর্বে অধঃপতিত বাম জমানার পতন ঘটাতে পথে নেমেও তৃণমূলের ঘোড়া হতে চাননি। বরং নাগরিক সমাজকে প্রতিষ্ঠানমুখী না হওয়ার আবেদন রেখেছিলেন নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে। এঁরা তৃণমূলী অনাচারের সূচনা থেকেই সরব। আর, যারা ঘোড়ায় পরিণত হয়েছিলেন তাদের অনেককে আর তৃণমূলী গাড়ী টানতে দেখা যাচ্ছে না। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে ফের বাম থেকে দক্ষিণ শিবিরে যাওয়ার একটা পর্ব শুরু হয়েছিল। এটা যেমন নিচের তলায় সামাজিক ভিত্তির স্তরে ঘটছে, তেমনি নাগরিক সমাজের মাঝারি মাপের কেষ্টবিষ্টুস্তরেও ঘটছে। বিশেষত সি পি এম ছেড়ে তৃণমূলে, বিজেপিতে; তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। এক ধরণের আনুগত্য বদল ঘটছে ক্ষমতার সঙ্গে লেপ্টে থাকতে, আনুগত্য পরিবর্তনের অপর কারণটি হল এক ক্ষমতার নিষ্পেষণের প্রতিক্রিয়ায় অন্য ক্ষমতার দ্বারস্থ হওয়া। তবে এসবই সব নয়। এই পরিবেশেও তৃণমূলের দক্ষিণপন্থা তথা বিজেপির তস্য দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে পক্ষান্তরে মূল্যবোধে-নীতিতে স্বচ্ছ ও স্বতন্ত্রচেতা থেকে নির্ভীকভাবে নাগরিক সমাজকর্মীরা মুখ যা খোলার খুলছেন। তবে তার জন্য তাদের চোখে সি পি এম আজও ঠিক গ্রহণীয় নয়।

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, সি পি এম, সি পি আই, এস ইউ সি আই (সি) প্রমুখ বাম দলগুলো এরাজ্যে বিজেপির কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী বিপদ এবং তৃণমূলের প্রতারণা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কিছু কিছু ইস্যুভিত্তিক যুক্ত উদ্যোগ শুরু করেছে। একে বামমুখী নাগরিক সমাজ উপেক্ষা করতে পারে না, করছেও না। তথাপি এটাও ঘটনা যে, বামফ্রন্ট মডেলের বাইরে এই আলাদা বৈশিষ্টের বৃহত্তর বাম উদ্যোগ নতুন প্রেক্ষিতে সংগঠিত হতে দেখেও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এখনও ঠিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে আশা প্রকাশ করতে এগিয়ে আসছেন না। তার অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে মূল কারণটি মনে হয় থাকছে সি পি এম-কে কেন্দ্র করে অবিশ্বস্ততা, অনীহার মধ্যে। যেহেতু সি পি এম বিগত বামফ্রন্ট আমলে কৃত মতাদর্শগত-রাজনৈতিক স্খলনগুলো আজও অকপটভাবে স্বীকার করার অবস্থায় আসেনি। সি পি এম এই পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রত্যুত্তর দেবে তা অনুমান করা এককথায় কঠিন। অন্যদিকে এস ইউ সি আই (সি)-ও তো সি পি এম আমলের মোকাবিলায় স্বতন্ত্র বাম মর্যাদার জায়গা থেকে স্খলিত হয়ে গিয়েছিল তৃণমূল-সঙ্গদোষে, যদিও পরবর্তীতে সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে আবার ফিরে এসেছে বাম ধারায়। ওই খটকাগুলো চাইলেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলার নয়। কিন্তু তা বলে নাগরিক সমাজের বাম-গণতন্ত্র মনস্কদের তো নিস্পৃহ-নিষ্ক্রীয় থাকলে চলে না। তাঁরা গুরুতর স্খলনগুলোর প্রতি সমালোচনা-সংগ্রাম প্রত্যাহার না করে অব্যাহত রেখেই এগিয়ে আসুন, বিজেপি-তৃণমূল—সবচেয়ে বিপজ্জনক দুই রাজনৈতিক প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে। আজকের পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার এই বিষয়টি দুর্বোধ্য লাগা উচিত নয়।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

'ভারতে তৈরী কর' ঃ এই অর্থনৈতিক রণনীতির এক সমালোচনামূলক তদন্ত

(লীলা গৌথম-এর প্রবন্ধের সংক্ষেপিত অংশ কাফিলা, ডিসেম্বর ২১, ২০১৪। লিবারেশন জানুয়ারি '১৫ পুনঃপ্রকাশিত থেকে অনুদিত)

'ভারতে তৈরী কর' এই চটকদার বুলি এখন সর্বব্যাপী। প্রত্যেকটি খবরের কাগজ, টেলিভিশন চ্যানেল মোদীর তূর্যনিনাদে বিনিয়োগকারীদের আহ্বানকে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করছে। কিন্তু সারবস্তুতে ফল শূন্য।

প্রথমত, আমি কতকগুলো ধাঁধার সম্মুখীন হয়েছি। যেমন, কেউই সঠিকভাবে নিশ্চিত নয় 'ভারতে তৈরী কর'-র উদ্দেশ্য বলতে ঠিক কি বোঝাচ্ছে। বি বি সি রিপোর্ট অনুযায়ী 'ভারতে তৈরী কর' বলতে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের হার ১৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ করা—অর্থাৎ ১০ শতাংশ বাড়ানো (যদিও কতদিনে হবে বলা হয়নি) এবং এর সূত্র বলা হয়েছে ভারত সরকারের 'কর্তৃপক্ষ'। আবার 'হিন্দু' পত্রিকায় 'সরকারি দপ্তর' সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি চালু রাখা।

দুটো ব্যাখ্যা মাথায় আসছে। ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্টতা রাখার খুব কার্যকরী কারণ হল এর মাধ্যমে লাইসেন্সপ্রথা হীনতা ও বিনিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষতার জন্য অসার বাগাড়ম্বর করা যায়। প্রায় প্রত্যেকে, অর্ণব গোস্বামী থেকে মেট্রোয় আপনার পাশের লোকটিও জানে (অথবা মনে করে জানে) 'ভারতে তৈরী কর' বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং এ ব্যাপারে বাস্তব তথ্য ছাড়া নিজের নিজের কাল্পনিক ধারণা মোদীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একাকার করে নেয়। আর এটাই আমার ধারণাকে আরও জোরালো করে যে 'ভারতে তৈরী কর' আগ্রাসী প্রচারের লক্ষ্য হল ভারতবাসীর মাথায় এটা ঢুকিয়ে দেওয়া যে সরকার একটা কার্যকরি পদক্ষেপ করেছে—কর্মসংস্থানের প্রশ্নে ও উন্নয়নের বাধাগুলোকে দূর করার লক্ষ্যে।

'ভারতে তৈরী কর'—এটা ঠিক কি?

'ভারতে তৈরী কর'—এর ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া কিছু কিছু পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে আমি আলোচনা করব।

ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের বিনিয়ন্ত্রণ এবং লাইসেন্স-প্রথার অবসান

১। কোন কোন কাজের নিরাপত্তা-মানের জন্য আত্ম-শংসাপত্র বা তৃতীয়-পক্ষের শংসাপত্রের প্রথা চালু করা, যেগুলো হল, অ-ঝুঁকিপূর্ণ বা বিঘ্নহীন এই শ্রেণীভুক্ত। এই সমস্ত কাজ পুরোপুরি আত্ম-শংসাপত্রের অধীন (শংসায়িত ব্যাপারটাই এখানে ভুল-নামাঙ্করণ)।

২। শিল্পের জন্য লাইসেন্সের আবেদন এখন থেকে একটি অন-লাইন পোর্টালে করা যাবে।

৩। শিল্প-লাইসেন্সের বৈধতা দুই বছর থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়েছে।

৪। প্রতিরক্ষা ও নির্মাণ শিল্পের মত বেশ কিছু সেক্টরে বিনিয়োগ পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয়েছে—(১৯৯৭-৯৮ সালে বিনিয়ন্ত্রণের শেষ পর্যায়ে মাত্র ৯টা শিল্পের জন্য কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ ছিল বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের প্রবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে—বর্তমানে তা আরও কমে গেল)।

নয়া পরিকাঠামো

১। শিল্প-উপযোগী জমি এবং বহু অত্যাধুনিক শহর তৈরী করা।

২। মেধাস্বত্ত্ব-রাজকে আরও শক্তিশালী করা—আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য করা।

৩। দক্ষতা বাড়ানো

ভারতের 'উচ্চমূল্যের' শিল্প-সেক্টরগুলোর দরজা খুলে দেওয়া

প্রতিরক্ষা, নির্মাণ এবং রেলকে ব্যক্তি-উদ্যোগের জন্য খুলে দেওয়া হল, প্রতিরক্ষা শিল্পে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাপকাঠিকে দ্বিগুণ করা হল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ১০০ শতাংশ অনুমোদনযোগ্য, রেল ও নির্মাণ শিল্পেও ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগযোগ্য।

নির্দিষ্টভাবে ২৫ সেক্টরকে লক্ষ্যে রাখা হয়েছে

এর মধ্যে রয়েছে অটোমোবাইল, মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ, বিমান, জৈব-প্রযুক্তি, রাসায়নিক শিল্প, প্রতিরক্ষা-ম্যানুফ্যাকচারিং, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, আই-টি, ওষুধ, রাস্তা ও সড়ক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, খনন, তেল ও গ্যাস এবং তাপ-বিদ্যুৎ ইত্যাদি শিল্প। এগুলো সবই পুঁজি নিবিড় ও এর জন্য প্রয়োজন খুবই দক্ষ শ্রমিক। যদিও এই শিল্প ততটা পুঁজি নিবিড় নয়, কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে এখানে সবই আমদানি করা প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে—যেখানে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না। এটা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের নতুন সরকারের রয়েছে আপাতভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী—যেটা তারা দাবি করেন নিরীহভাব—''বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন আনা দরকার; অনুমোদন দেওয়া কর্তৃপক্ষ হিসেবেই শুধুমাত্র নয়, পরন্তু প্রকৃত ব্যবসায়িক অংশীদারের মতই''।

পরিশিষ্ট

'৯০ দশকের প্রথমদিকে কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের শুরু করা সংস্কার কর্মসূচীর ধারাতেই বর্তমানের পরিবর্তনগুলো চলছে। বিনিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স-প্রথার অবসান এবং ইন্সপেক্টর ও

আটের পাতায় দেখুন

হর্স ট্রেডিং-এর কারবার যেন না হয় বারবার

তাঁর জহুরীর চোখ। আস্‌লি চিজ চিনে নিতে তাঁর ভুল হয় না। এক হাট ঘোড়ার মধ্য থেকে এক নিমেষে অন্য সব পাইকেরকে টেক্কা দিয়ে সব থেকে চেকনাই পোষ্যটাই আর নধর ঘোড়াগুলোকে সওদা করে নিতে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি শ্রী মুকুল রায়। হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতিতে, নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে 'হর্স ট্রেডিং' আমদানি করা ও তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি একমেবদ্বিতীয়ম। প্রধানত এ কারণেই তৃণমূল সুপ্রীমোর পর টি এম সি-র তিনিই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূল্যবান রত্ন।

তৃণমূল কংগ্রেসে মুকুল রায়ের সুউচ্চ আসনের আর একটি মস্ত বড় কারণ রয়েছে। দিদি যেখানে দলের কাণ্ডারী মুকুল সেখানে ভাণ্ডারি। দলের ধনভাণ্ডার গড়ে তোলা ও রক্ষা করার মহান কর্মযজ্ঞ তিনি প্রায় একা হাতে সামলেছেন। তবে অর্থ যেহেতু অনর্থের মূল তাই শেষ অবধি মুকুলের এখন ঝরে যাওয়ার পালা। কিন্তু শুধু 'মুকুল' নয়, গোটা তৃণমূল বিষবৃক্ষটিই এমুহূর্তে নিয়ত কম্পনের সম্মুখীন হচ্ছে।

'৭৭ থেকে পরপর চারবার বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ফেরত আসার পর এ রাজ্যে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। কংগ্রেসের পুরনো অংশটি সি পি এমের প্রতি তোষণ নীতি গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে নিজেদের কিছু সুবিধা আদায় অন্যদিকে সি পি এম দলটিরই ধীরে ধীরে কংগ্রেসীকরণের মাধ্যমে তাকে শেষ করে দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণ করে। কংগ্রেসের নব্য অংশটি অত ধীর ও জটিল কৌশলের পরিবর্তে সরাসরি বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য সি পি এমের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বা দ্রুত হেস্তনেস্ত করার পথে এগিয়ে যেতে চাইছিল। বেপরোয়া, ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে সরকার বিরোধিতার জন্য নব্যধারার কংগ্রেসীদের প্রয়োজন ছিল এক আগুনখোর ফায়ারব্রাণ্ড নেতা। মমতা ব্যানার্জী সর্ব অর্থেই এই ধারার সর্বোত্তম রোল মডেল হয়ে ওঠেন। তারপরে দিদি নাম্বার ওয়ান তো পাওয়া গেল। কিন্তু তার মার্কেটিং-এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দক্ষিণপন্থী সম্ভ্রান্ত, ধনী পরিবারগুলো, বৃহৎ পুঁজিশ্রেণী এবং বণিককুল দ্বিধা ও সঙ্কোচ নিয়ে আড়ালে আবডালে যে অর্থ জোগান দেবে তাতে তো প্রয়োজন মিটবে না। ইতিমধ্যে সাবেক কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নব্যধারায় কংগ্রেসীরা মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস দলেরও জন্ম দিয়ে ফেলে। সুতরাং কাঁচা টাকার আড়তের দিকে তাদের নজর গেল। কাঁচরাপাড়া রেল ওয়ার্কশপে সেই সময় বেহিসেবী কাঁচা টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই 'কালা ধনে'র ওপর পুরো কর্তৃত্ব তখন সাবেক কংগ্রেসীদের সোমেন-ঘনিষ্ঠ এক নেতার হাতে। সোমেন বান্ধব এই কংগ্রেসী নেতাটি রেলের অকশনে বাতিল লোহা-লক্কড় (স্ক্র্যাপ) কেনার একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী। মুকুল ছিলেন তারই দোসর। লোকমুখে শোনা যায়, সোমেন ঘনিষ্ঠ ঐ কংগ্রেসী নেতাটি ব্যারাকপুরের এক সি পি এম সাংসদকে লাভের যতটা অংশ উপঢৌকন দিতেন মুকুলের ভাগে তার থেকে বেশী কিছু জুটত না। মমতা টি এম সি গঠন করার পর কাঁচরাপাড়াকে টার্গেট করেন। কিন্তু সোমেন গ্রুপকে টেক্কা দিয়ে তিনি সেখানে ঢুকবেন কি ভাবে? মুকুল নিজের গরজেই টি এম সি-তে নাম লিখিয়ে মমতাকে কাঁচরাপাড়া-বীজপুরে প্রবেশের পথ করে দেন। রাজ্যের ক্ষেত্রে সোমেন মিত্র সমেত সাবেক কংগ্রেস যেমন মমতাকে ময়দান ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, তেমনি কাঁচরাপাড়াতেও রেলের স্ক্র্যাপ কেনা-বেচার সাম্রাজ্যও স্থানীয় কংগ্রেসী দাদার কব্জা থেকে খসে মুকুল রায়ের হাতে জমা হয়। অর্থের জোগানদার বা ফাইনান্সার হওয়ার সুবাদে মুকুল সেই যে দলনেত্রীর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তারপর থেকে দলের মধ্যে তার জেট গতিতে উত্থান।

নিত্যনতুন কায়দায় অর্থ সংগ্রহে মুকুলের 'দক্ষতা' প্রশ্নাতীত। দলনেত্রীর আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে এই দক্ষতা বেড়েই চলে। এন ডি এ সরকারে নেত্রী রেলমন্ত্রী হলেন; পরে ইউ পি এ-২ সরকারে আবার রেলমন্ত্রী হলেন। ফলে রেলের ঠিকাদার-আমলাকুলের সঙ্গে দোস্তির মাধ্যমে মুকুল টাকার নিত্যনতুন খনি আবিষ্কার করলেন। নেত্রীর প্রসাদে জাহাজ মন্ত্রকে প্রতিমন্ত্রীর পদ পাওয়ার পর কলকাতা বন্দর (হলদিয়া সমেত) এলাকার ইজারাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 'তোলা' ওঠানোর কাজেও তিনি অধিশ্বর হয়ে ওঠেন। নিশ্চিতভাবেই এই বিপুল অর্থের সবটুকুই তাঁর পকেটে যায়নি, দলের তহবিলে অনেকটাই জমা পড়েছে। দলে সর্বময় আর্থিক কর্তৃত্ব পাওয়ার সুবাদে সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের চটকদার ভূষণও তাঁর অঙ্গে জড়িয়ে যায়।

আঞ্চলিক দল তৃণমূলের গায়ে 'সর্বভারতীয়' ছাপ লাগানোর ক্ষেত্রে মমতা-মুকুলের যুগলবন্দী নিয়ে কিছু বলতেই হয়। আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে কখনো মসনদ হাতছাড়া হলেও নিজ রাজ্যের বাইরে কিছু এম পি, এম এল এ থাকলে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে দরকষাকষির সুযোগটা ফসকে যায় না। মায়াবতী এই স্টাইলটা প্রথম সামনে আনেন। মমতা-মুকুলেরও এই স্টাইলটা খুবই মনে ধরে। পশ্চিমবঙ্গকে মূল কেন্দ্রবিন্দু রেখে তাই আশপাশের রাজ্যেও চটজলদি কিছু সিট পাওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অভিঘাতে ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনে সি পি এমকে ছাপিয়ে টি এম সি-র এম পি সিট অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় মমতার নির্দেশে মুকুল অপারেশন শুরু করে দেয়। আর 'হর্স ট্রেডিং' বা এম এল এ-এম পি কেনাবেচার খেলায় মুকুল তখনই এক্সপার্ট হয়ে ওঠে। শারদ পাওয়ার, পি এ সাঙমার কাজিয়াকে কাজে লাগিয়ে দল ভাঙ্গাভাঙ্গির খেলায় মণিপুরে তিনি তাক লাগিয়ে দেন। সেখানে ৭টি এম এল এ আসন এবং আসাম ও অরুণাচলে ১টি করে আসন জিতে প্রচার মাধ্যমে মুকুল ডাকসাইটে সংগঠকের খেতাব পেয়ে যান। তার বঁড়শিতে তখন টোপ ফেলতেই মাছ উঠে আসছে। কিন্তু কে জানত, এই বঁড়শিই শেষে তার গলায় বিঁধে যাবে! উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নির্বাচনে বেশ কিছুটা সাফল্যের সাথে সাথে মুকুল ম্যাজিকে টি এম সি উত্তরপ্রদেশেও একটা এম এল এ আসন জিতে নেয়। মাঝে ঝাড়খণ্ড থেকেও এক ফাটকা পুঁজিপতিকে রাজ্যসভার সদস্য করে আনার ক্ষেত্রেও সেই মুকুল জাদু। যদিও অতিরিক্ত এসব বাহাদুরিই যাদুকরকে শেষে পথে বসিয়ে ছেড়েছে।

মুকুলের উত্তুঙ্গ সাফল্যের আবহেই মমতা জাতীয় রাজনীতিতে 'কিং মেকার' হওয়ার নির্দিষ্টভাবে বললে ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। মমতার হিসেব ছিল, ২০১৪-এর নির্বাচনে দিল্লীতে কংগ্রেস বা বিজেপি কেউই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না (কী আশ্চর্য! বুদ্ধবাবুরাও ভেবেছিলেন, কংগ্রেস-বিজেপি ভিন্ন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোই ২০১৪-তে সরকার গঠনে নির্ধারক শক্তি হবে)। সুতরাং মমতা চাইলেন যত বেশী সংখ্যায় পারা যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিট জিতে নিতে। কিন্তু সারদা কলঙ্ক তাঁর পিছু ছাড়ছে না। এক্ষেত্রেও কলঙ্ক মোচন করে দিদিকে দিল্লীর তখত্ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে মুকুলই কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত আন্না হাজারেকে দিয়ে তিনি মমতার অনুকূলে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট জোগাড় করে ফেলেন। সকলে তখন তারিফ করে বলছে—সংগঠক হিসেবে মুকুল অসাধ্য সাধন করতে পারেন। কিন্তু শুধু নোটের বাণ্ডিল আর ভাড়া করা লোক দিয়ে সব জায়গায় বাজি মাত করা যায় না। মুকুলের ইশারায় রামলীলা ময়দানে আন্না হাজারে আসবেন আর ভরা ময়দানে মমতা দিল্লী মাতিয়ে দেবেন—টি এম সি-র সে স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান। আন্নার অনুপস্থিতিতে জনশূন্য মাঠে মমতা হয়ত সেদিন নিজের নিঃসঙ্গ ভবিষ্যতের ললাট লিখন দেখতে পেয়েছিলেন। 'দাপুটে সংগঠক' মুকুলের সমস্ত ফক্কিবাজি রামলীলা ময়দানে সেদিন উলঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। লোভী আর পদপ্রার্থী ভিন্ন অন্যদের জয় করার ক্ষমতা তার যে ছিল না তা তখনই প্রমাণ হয়ে যায়।

কিন্তু মুকুল গুণনিধি। লজ্জায় মাথা হেঁট করার বান্দা তিনি নন। দিল্লীর অ্যাডভেঞ্চার ছেড়ে তিনি আবার পরিচিত ময়দানে নতুন উদ্যোগে অপারেশন শুরু করলেন। শকুনের দৃষ্টিতে তিনি বিরোধী শিবিরের অন্দরে ফাঁকফোকর খুঁজতে থাকেন। বিরোধী দলগুলোর দখলে থাকা পঞ্চায়েত-জেলা পরিষদ-পুরসভা অবলীলায় আবার ভাঙ্গতে থাকেন। সারদা কলঙ্কে জর্জরিত মুকুল শেষ রাউণ্ডেও বিরোধীদের টুঁটি চেপে ধরতে পিছপা হননি। ২০১৪-এর ২১ জুলাই তৃণমূলের শহীদ দিবসে কংগ্রেস, আর এস পি-র সঙ্গে সঙ্গে সি পি এমের এক বিধায়ককে পর্যন্ত মমতার পদতলে হাজির করেছেন। তৃণমূলের সন্ত্রাসের যে ভয়াবহতা তা মুকুল রায়ের দল ভাঙ্গানোর কূট কৌশলের জন্যই এত বেলাগাম হতে পেরেছে।

এম এল এ-এম পি কেনা বেচা থেকে শুরু করে নির্বাচনের সময় দূরদর্শনের চ্যানেলে চ্যানেলে বিজ্ঞাপণ, আকর্ষণীয় রোড-শো, হোর্ডিং হোর্ডিং-এ চতুর্দিকে মুড়ে দেওয়া ইত্যাদির জন্য যে বিপুল অর্থ টি এম সি ব্যয় করেছে তার প্রধান উৎস এখন সকলেই জেনে গেছেন। কিন্তু সারদা কোম্পানির টাকা টি এম সি-র নেতা-মন্ত্রী কর্তৃক আত্মসাৎ করা তো ভাসমান বরফের দৃশ্যমান অংশ মাত্র। আরও কত টাকা, কোন্ চোরা পথে কী কী উপায়ে মুকুল বাহিনী পাচার করেছে তা হয়ত ভবিষ্যতে জানা যাবে। কিম্বা হয়ত সবটুকু কোনদিনই জানা যাবে না। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দুর্নীতি বিরোধী গণআন্দোলনে হাজারো মানুষ যদি সক্রিয় হতে থাকেন তাহলে দুর্নীতি-চক্রে ফাটল ধরবেই, দেখা দেবে অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই ফাটল আর অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই আসিফ খানেরা মুখ খোলেন। মুখোশ খুলে যায় মুকুল কোম্পানির এবং বেআব্রু হয়ে যায় তাদের 'সততার প্রতীক' দলনেত্রীর।

মুকুলবাবুরা সুপ্রীম কোর্টে গেছেন। এতে এ যাত্রা মুকুলদের শ্রীঘর বাস ঠেকানো যাবে কীনা স্পষ্ট হচ্ছে না। বুর্জোয়া আইনি ব্যবস্থা সমাজের খল নায়কদের রক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকে তা সমাজসচেতন, গণআন্দোলনের কর্মীদের অজানা নয়। কর্পোরেটমুখী যে পরগাছা-অর্থনীতি দেশের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রকে মুমূর্ষু ও সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে সেখানে কালো টাকার দাপট আর দল ভাঙ্গানোর খেলা সহজে বিদায় নেবে না। কিন্তু লাগাতার লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অন্যায়কারীদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া যায়। এ বিশ্বাসকে কোন মতেই দুর্বল হতে দিলে চলবে না।

সংসদসর্বস্ব রাজনীতিতে হর্স ট্রেডিং এবং কালো টাকার যাদুতে প্রশাসনিক ক্ষমতায় আসার জন্য মুকুল রায়ের নাম এ রাজ্যে খোদাই হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবী মানুষ, সংগ্রামী ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি এ কলঙ্ক মোচনের জন্য নিজেদের মেরুদণ্ড খাড়া করে উঠে দাঁড়াবেন। টি এম সি-র পর উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে মোদী বাহিনীর অনুচরেরা একই গেম খেলতে চাইছে। আমাদের সগর্জনে তাদের সকলকেই বলে দিতে হবে—খবরদার!

- মুকুল কুমার

তৃণমূল-বিজেপির সন্ত্রাস-পাল্টা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন্নগরে মিছিল

একদিকে যখন দেশজুড়ে শ্রমিক-কৃষক আক্রান্ত, ঠিক সেই সময় সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে তৃণমূল ও বিজেপি যেভাবে রাজ্যে সন্ত্রাস-পাল্টা সন্ত্রাসে লিপ্ত হচ্ছে তারই প্রতিবাদে জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার দাবিতে সি পি আই (এম এল) হিন্দমোটর-কোন্নগর আঞ্চলিক কমিটির আহ্বানে গত ১১ জানুয়ারি এক মিছিল সংগঠিত হয়। ১০০ জন মানুষ এই মিছিলে পা মেলান। মিছিলে যেমন নির্মাণ শ্রমিক সামিল হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মহিলারাও সামিল হয়েছিলেন। মিছিল পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে জোড়াপুকুর, বেঙ্গল ফাইন মোড়, চলচ্চিত্র মোড়, ক্রিপার রোড পরিক্রমা করে আবার স্থানীয় পার্টি অফিসে এসে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পার্টির জেলা কমিটির সদস্য প্রদীপ সরকার, আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক অপূর্ব ঘোষ, সদস্য দীপঙ্কর সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কমরেড ব্যোমকেশ ব্যানার্জীর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী সভা

গত ১৮ জানুয়ারি চুঁচুড়া লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড ব্যোমকেশ ব্যানার্জীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। সকালে পার্টি অফিসে রক্ত পতাকা উত্তোলন, কমরেডের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও নিরবতা পালন করা হয়। পার্টির লোকাল সম্পাদক স্বপন গুহর স্মৃতিচারণা ও বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সকালের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। বিকেলে পার্টি অফিস সংলগ্ন স্থানে ব্যোমকেশ ব্যানার্জী স্মরণে ''সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ও বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির কর্তব্য'' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির জেলা কমিটি সদস্য মুকুল কুমার, পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগী সনৎ রায়চৌধুরী, সুদর্শন বসু, সাধন বসু ছাড়াও ব্যোমকেশদার সত্তরের রাজনৈতিক সঙ্গী ভোম্বল মান্না, বোন কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিবেশী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। সমগ্র আলোচনা সঞ্চালনা করেন লোকাল কমিটি সদস্য কল্যাণ সেন।

... এক সমালোচনামূলক তদন্ত

সাতের পাতার পর

লাইসেন্স-রাজের অবসানের জন্য বাগাড়ম্বর মোদীর কোন নতুন আবিষ্কার নয়। যাই হোক, কতকগুলো কথা মাথায় রাখা দরকার ঃ

● নয়া শিল্পের জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন হবে এবং তা অধিগ্রহণ করতে গেলে বহু সামাজিক সংগ্রাম হবে বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্বারা।

● আন্তর্জাতিক মেধা স্বত্ব-রাজের মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার উদ্রেক হবে, বিশেষত, ভেষজ ও ওষুধের লভ্যতার ক্ষেত্রে।

● দক্ষতা-বর্ধনের জন্য কোন মনোযোগ নেই। 'ভারতীয় যুবকদের কল্যাণ'-এর জন্য ক্রমাগত প্রচার একটা হেঁয়ালির মত। কারণ 'ভারতীয় চর্ম উন্নয়ন কর্মসূচী' ছাড়া আর কোন প্রকল্প নেওয়া হয়নি। এর মাধ্যমে এক লক্ষ যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে—যেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল, বর্তমানে কর্মহীনতার নিরীখে বা আগামীদিনে আরও বেকারত্বের হারের ক্ষেত্রে। এটা গুরুত্বপূর্ণ, পরবর্তী বিষয়ের ক্ষেত্রে।

● যে সেক্টরগুলোতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে, সেগুলো হল পুঁজি নিবিড়—যেমন, তথ্যপ্রযুক্তি, বিমান, অটোমোবাইল ইত্যাদি। এই সেক্টরগুলোয় খুব দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন ও বিশাল সংখ্যায় শ্রমিকের দরকার হয় না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া খুবই কম শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়।

'ভারতে তৈরী কর'—রণনীতিটির মর্মার্থ

প্রকৃত অর্থে, নীতিটিকে বোঝা ও তার বিশ্লেষণ করতে গেলে আগে বুঝতে হবে এর ঘোষিত বস্তুগত দিকগুলো এবং এর মাধ্যমে ঐ বস্তুগত বিষয়গুলো কতটা অর্জন করা যেতে পারে এবং পরিশেষে বস্তুগত বিষয় ও রণনীতিটিকে নিয়ে পর্যালোচনা করা।

বস্তুগত বিষয়গুলো কিছুটা ধোঁয়াশা। মোদী বলছেন, ''ভারতকে ম্যানুফ্যাকচারিং বাড়াতে হবে এবং একই সাথে নিশ্চিত করতে হবে এর সুফল যেন দেশের যুবকবৃন্দ লাভ করে''। (কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং না বাড়লে তো সুফল আসবে না এবং সেখানেই এটার কি পরিসমাপ্তি ঘটবে না?) কিন্তু, ধরা যাক সন্দেহের অবকাশ না রেখে তাঁর বস্তুগত লক্ষ্য হল ঃ ভারতের ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে ব্যক্তিগত উদ্যোগের বৃদ্ধি ঘটিয়ে। এর পরবর্তী ধাপ হল ভারতকে বিশ্ব ম্যানুফ্যাকচারিং বাজার মূল্যে আবদ্ধ করা যা ভারতের রপ্তানীমুখী শিল্প বৃদ্ধি ঘটানোর সহায়ক হবে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে পরবর্তীতে এর ফলাফল কি হবে, কিভাবেই বা এটা এগোবে, লাভবান কারা হবে—অন্যভাবে বললে 'ভারতে তৈরী কর'—এর রাজনৈতিক অর্থনীতি কি?

'ভারতে তৈরী কর'—
এর রাজনৈতিক অর্থনীতি

'ভারতে তৈরী কর'—মূলগতভাবে ভারতীয় অর্থনীতির উৎপাদন পরিকাঠামোকে বদলে ফেলার একটা প্রচেষ্টা। কৃষি উৎপাদন থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ পরিবর্তন এবং এটাই আমাদের মস্তিষ্কে ঢাক পিটিয়ে বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা হল ঃ কি ধরণের শিল্প আমরা চাইছি?

রপ্তানির জন্য পণ্য উৎপাদন এবং যে পণ্য বহুজাতিক কোম্পানিরা উৎপাদন করবে তার একটা নির্দিষ্ট তাৎপর্যও থাকবে এবং সেটি অবশ্যই বিবেচনাধীন। এই পণ্যের চাহিদা হবে বিদেশের রপ্তানি বাজারে এবং শহরাঞ্চলে/মেট্রোপলিটান মধ্যবিত্তশ্রেণী, গ্রামীণ ধনীক শ্রেণীর থেকে। অন্যভাবে বললে, দেশের বাজার হবে খুবই সঙ্কীর্ণ—ফোর্ড বা হণ্ডা গাড়ী নিশ্চয়ই গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক বা শহুরে ঠিকা শ্রমিকদের জন্য তৈরী হবে না।

অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার ব্যাপার হল এই শিল্পগুলো হবে পুঁজিনিবিড় এবং/অথবা এখানে নিয়োজিত হবে বেশিরভাগ দক্ষ শ্রমিকরা (কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে নামমাত্র, বিশেষত দেশজ শিল্পগুলো হয় উৎখাত হবে নয় টালমাটাল অবস্থায় পড়বে)। বিদেশী বিনিয়োগ কেন কর্মসংস্থানের সহায়ক হবে না। তার কারণ হল ঃ বিদেশী বিনিয়োগকারীরা উন্নতমানের পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদন করে যার ফলে পুঁজি-শ্রমিক অনুপাতের প্রতিফলন হয় এবং এটাই উন্নত পুঁজিবাদী দেশে প্রচলিত। এই কারণে এই ধরণের বিনিয়োগ খুব দক্ষ এবং উচ্চ-বেতনের শ্রমিকদের নিয়োগ করে, ফলে সামগ্রিক আয় বণ্টন ক্রমেই নিম্নগামী হয়।

এই পারস্পরিক-শক্তিবৃদ্ধি চক্রের মাধ্যমে গোটা অর্থনীতি পুনর্গঠিত হয় এবং নতুন করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় এবং এর ফলে কিছু কিছু শ্রেণী অর্থনীতির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, বিজেপি-রাজের পরিকল্পনায় সমস্ত ধরণের সামাজিক সহায়তা বিনষ্ট করা—যেমন শ্রম আইন থেকে এম এন আর ই জি এ—এবং বৃদ্ধি জনিত সঞ্জাত সুফল থেকে গরিবের বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি। এটাও দেখা যাবে গরিবের আয় ক্রমাগত কমছে। কৃষিতে নিযুক্ত কৃষি শ্রমিকরা কর্মচ্যুত হবেন কিন্তু শহরে প্রচুর ঠিকা শ্রমিক এবং কন্ট্রাক্ট শ্রমিকের বাহুল্য দেখা যাবে—যারা শোষিত হয়েও প্রান্তিক অবস্থায় থাকবে।

রপ্তানি-নির্ভর সঙ্কীর্ণ ভিত্তিক বৃদ্ধির
বাধ্যবাধকতা এবং সীমা

আমরা দেখলাম 'ভারতে তৈরী কর' এবং রণনীতি কিভাবে পাশাপাশি চলে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ফয়দা বাড়ায় অথচ যারা দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী তাদের আরও প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়, সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই রণনীতি ব্যর্থ হবে।

১। অন্তর্দেশীয় বা দেশের নিজস্ব চাহিদা অবধারিতভাবে রুদ্ধ হবে (এবং রণনীতির সামগ্রিক ব্যাপ্তিতে রুদ্ধতার মুখে পড়তে বাধ্য, যুক্তি হিসাবে বলা যায়, ভারতীয় জনতার একটা বিশাল অংশের মানুষের কাছে আয়কে বণ্টন করার পরিবর্তে আবশ্যিকভাবে বঞ্চনা করা হবে)। উন্নত দেশগুলোর ভারতীয় রপ্তানীর চাহিদা কমতে থাকবে, বিশেষত যখন বিশ্বজুড়ে মন্দার আবহাওয়া চলছে—যে আশঙ্কার কথা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর বলেছেন।

২। পরিকাঠামোর অভাব। পুরোপুরি কলঙ্কিত পিপিপি (সরকার-ব্যক্তি মালিকানা অংশিদার) মডেলে পরিকাঠামো গড়ে তোলাটা বাস্তব সমস্যা।

৩। ভারতে বিদেশী পুঁজি আনার জন্য কতকগুলো পদক্ষেপ করতে হবে। নিশ্চিত আশ্বাস দিতে হবে সস্তা উৎপাদন খরচ, পুঁজিকে সস্তা শ্রমের যোগান এবং সস্তায় প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান—এর বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখছি সাম্প্রতিককালে শ্রম আইন, জমি অধিগ্রহণ আইনে পরিবর্তন, পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রে নমনীয়তা ইত্যাদি। সামাজিক প্রতিরোধ এই সমস্ত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গড়ে উঠবে।

৪। অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতেও সস্তা-উৎপাদন খরচের প্রতিযোগিতামূলক হাতছানি, যার মোকাবিলায় আমাদের দেশকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করে বিনিয়োগের অনুকূলে আবহাওয়া নিশ্চিত করতে হবে—এবং অবশ্যই কখনও কখনও দেশের মধ্যে তৈরী হওয়া সামাজিক প্রতিরোধ এবং সংগ্রামকে ধামাচাপা দিয়ে।

পরিশেষে

'ভারতে তৈরী কর'—ভারতীয় অর্থনীতির কোন অভিনব ধারণা বা আমূল পরিবর্তনের ডাক নয়, যেভাবে তাকে দেখানো হচ্ছে—বরং নব্বই-এর দশক থেকে যে কর্মসূচী প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বহু আলোচনা, বিতর্কের মাধ্যমে, তাকেই আরও তীব্রভাবে নিয়ে আসা হচ্ছে (আরও প্রকট, আরও নগ্নভাবে এবং আরও সুস্পষ্টভাবে)। এর দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রান্তিক দরিদ্র এবং অসহায় মানুষেরা আরও খারাপ অবস্থায় পতিত হবেন—এই রণনীতি সফলতা পাক বা না পাক।

কর্পোরেট পুঁজি, সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানালো সাংস্কৃতিক সম্মেলন

১৮ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতার সন্তোষপুরে ঋষি অরবিন্দ বিদ্যাপীঠে পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের অষ্টম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী প্রয়াত নবারুণ ভট্টাচার্যের নামে সভার মঞ্চটির নামকরণ করা হয়। পোস্টার, ব্যানার, ক্যানভাসে গোটা স্কুলবাড়িটিকে সুসজ্জিত করেন সম্মেলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেডরা। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৬০ জন প্রতিনিধি, ১০ জন পর্যবেক্ষক ও ২০ জন অতিথি। সকাল ১১টায় এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পরিষদের বিদায়ী যুগ্ম-সম্পাদক অমিত দাশগুপ্ত। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনসংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষে সুধীর সুমন, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সমিতির পক্ষে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই পি সি এ-র পক্ষে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। সি পি আই (এম এল)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব বসু, কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের পর্যবেক্ষক হিসাবে।

বর্ষীয়ান কমরেড বিপ্লব বাগচী, প্রিয় গোপাল বিশ্বাস, প্রবীর বলকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাকা ভট্টাচার্যের গান দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে নীতীশ রায় খসড়া প্রতিবেদনটি আলোচনার জন্য পেশ করেন। প্রায় ১৬ জন বক্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা সবাই হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী গৈরিক বাহিনীর ধর্মীয় মেরুকরণ, ঘৃণা ও প্রতারণার রাজনীতির বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানো ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মোদী সরকারের ক্রমবর্ধমান কর্পোরেট ও সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তফশিলী জাতি/উপজাতির মানুষগুলোকে বিভাজিত করে আরও প্রান্তিকীকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। লিঙ্গ বৈষম্য, নারী নির্যাতন, লাভ জেহাদ—এসব কিছুই মোদী রসায়নের উপাদান; অন্যদিকে জল-জমি-জঙ্গল সহ চিরায়ত গ্রামীণ লোক সংস্কৃতির আঙিনাও আজ কর্পোরেট হামলার সম্মুখীন। আউল বাউলের সাংস্কৃতির মধ্যে সহজাত প্রতিষ্ঠান বিরোধী উপাদানগুলো ঐ হামলার মুখে হারিয়ে যেতে বসেছে।

এ রাজ্যে স্বৈরতান্ত্রিক একনায়িকার শাসনে এক সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ কায়েম হচ্ছে যার জন্ম লুম্পেন ও ধান্দাপুঁজির জঠর থেকে। লুঠ, দমন, নারী নির্যাতন ও ভাষা সন্ত্রাসের এক অন্ধকারের সংস্কৃতি—এক কথায় যা তাপস পালীয় সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত।

দিল্লীর নির্ভয়াকাণ্ড থেকে উঠে আসা নিঃশঙ্ক স্বাধীনতার দাবি, যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলন ''হোক কলরব'' থেকে সঞ্জাত প্রতিরোধের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অথবা চা বাগানের নেপালী, গোর্খা, আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ নাছোড় লড়াই থেকে অর্জিত ঐক্যের ও প্রতিরোধের সংস্কৃতি শাসকের আধিপত্যবাদী বিভেদকামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুখের মতো জবাব। ভারতবর্ষের মত বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে সাংস্কৃতিক বহুত্বের মধ্যে নিহিত আছে গণতান্ত্রিক উপাদান, যাকে আত্মস্থ করেই সাম্প্রদায়িক ও কর্পোরেট আগ্রাসনকে পরাস্ত করার আহ্বান জানান বক্তারা। এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী বাম গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন আমন্ত্রিত অতিথি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সলিল চৌধুরীর ''শপথ'' ও নবারুণ ভট্টাচার্যের ''এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়'' কবিতা দুটি আবৃত্তি করে শোনান সম্মেলনে উপস্থিত অতিথি দীপ্তেন ব্যানার্জী—যা সাথীদের আলোড়িত করে তোলে। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন অসীম গিরি। সমাপ্তির আগে আগামী দুবছরের কাজ পরিচালনার জন্য ২১ সদস্যের একটি কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়। খসড়া প্রতিবেদনটি প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নতুন যুগ্ম রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বাবুনি মজুমদার ও শান্তনু ভট্টাচার্য এবং কার্যকরি সভাপতি অমিত দাশগুপ্ত।

সম্মেলনটির আয়োজনে যাদবপুর-সন্তোষপুর পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন কাণ্ডীব ও সংযোগ সাংস্কৃতিক সংস্থার বন্ধুরা প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের নিরলস পরিশ্রম ছাড়া সম্মেলনটিকে কখনই সফল করা যেত না। সম্মেলনে প্রদর্শিত ছবি, ক্যানভাস ও ফ্লেক্সের দায়িত্বে ছিলেন আকাশ, কল্লোল প্রমুখ।

''আজকের দেশব্রতী'' জানুয়ারি মাসের মধ্যে গ্রাহক অভিযান সম্পন্ন করুন

''আজকের দেশব্রতী''
বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হবে অনিবার্য কারণবশতঃ কলকাতা বইমেলার পরে
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com